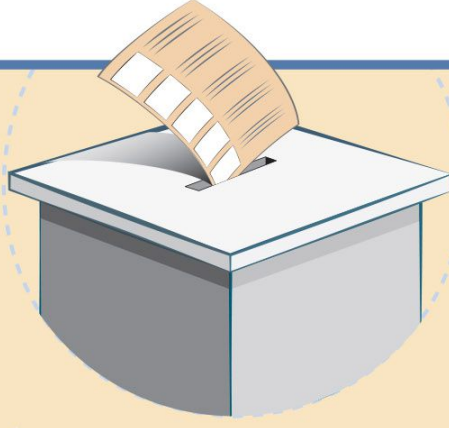


নির্বাচন প্রতিবেদন নির্দেশিকা

GUIDELINES FOR ELECTION REPORTING



সাধারণ নির্বাচন
ও
গণভোট



প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)



তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

মুখবন্ধ

এই নির্দেশিকা বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনকে (ইসি) সহায়তার জন্য জাতিসংঘের নির্বাচন সহায়তা উদ্যোগ BALLOT প্রকল্পের আওতায় ইউনেস্কোর কারিগরি সহায়তায় এবং প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (PIB) -এর সামগ্রিক তত্ত্বাবধানে প্রণীত হয়েছে। গণমাধ্যমের সক্ষমতা বৃদ্ধি, তথ্যের নির্ভুলতা এবং দায়িত্বশীল নির্বাচন প্রতিবেদন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উদ্যোগটি গ্রহণ করা হয়। নির্দেশিকাটি নির্বাচন কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত।

বাংলাদেশে একইসাথে একটি ঐতিহাসিক গণভোট এবং জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এটি একটি নতুন পরিস্থিতি। অনেক সাংবাদিকের এই ধরনের পরিস্থিতি নিয়ে সরাসরি কাজের অভিজ্ঞতা কম। গত দেড় দশকে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের সুযোগ সীমিত ছিল। ফলে, সাংবাদিকদের ওপর মাঠের পরিস্থিতি, নিয়মের খুঁটিনাটি, আর নৈতিক সিদ্ধান্তের চাপ একসাথে এসে পড়েছে। সাংবাদিকতা চাকরি নয় বরং এটি একটি দায়িত্বশীল ও কল্যাণমুখী পেশা। নির্বাচনের সময় সংবাদকর্মীরা একদিকে যেমন তথ্যের উৎস, অন্যদিকে তার বাহকও। তাঁদের কাজ শুধু ভোটারকে তথ্য দেওয়া নয়। নির্বাচনের বিশ্বাসযোগ্যতা, স্বচ্ছতা আর জবাবদিহির পরিবেশ তৈরিতে তাঁদের ভূমিকা থাকে। কিছুটা হলেও এই অভাবটা পূরণ করার জন্য নির্বাচন প্রতিবেদন নির্দেশিকাটি তৈরি করা হয়েছে। PIB ইউনেস্কোর আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের সহযোগিতায় এই কাজটা সম্পন্ন করেছে। ইউনেস্কোর Elections in Digital Times অনুযায়ী গণতন্ত্রের জন্য দরকার অবাধ, স্বচ্ছ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচন। আর এরকম নির্বাচন আয়োজনের অংশীজন হিসেবে গণমাধ্যমের জন্য দরকার মুক্ত ও স্বাধীন এবং বহুত্ববাদী পরিবেশ। গণমাধ্যমগুলো যেন কোনো দল, প্রার্থী বা রাষ্ট্রের প্রচার বিভাগ হয়ে না দাঁড়ায়, PIB এ বিষয়টি নির্দেশিকায় জোরালো ভাবে তুলে ধরেছে। ইউনেস্কোর Freedom of Expression, Artificial Intelligence and Elections রিফ্রে বলা হয়েছে, তথ্য খোঁজা, গ্রহণ করা আর বিনিময়ের অধিকার মতপ্রকাশের স্বাধীনতার অংশ। এই অধিকার ছাড়া বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন হয় না।

পিআইবি ভারসাম্যপূর্ণ ও তথ্যপ্রমাণভিত্তিক সংবাদ প্রদানের লক্ষ্যে এবং নাগরিকের তথ্য পাওয়ার অধিকারকে সামনে রেখে সাংবাদিকদের জন্য এই নির্দেশিকা তৈরি করেছে। মনোনয়ন ও প্রচারণা থেকে ভোটগ্রহণ, ইশতেহার, হলফনামা, সীমানা নির্ধারণ, ভোটার, নির্বাচন কমিশন, এমনকি নির্বাচনোত্তর বিশ্লেষণ এবং আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের মতো বিষয়ও এই নির্দেশিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

অনলাইনে ভুল তথ্য আর বিভ্রান্তি খুব দ্রুত ছড়ায়। মানুষ অনেক সময় যা দেখতে পছন্দ করে, অ্যালগরিদম তাকে সেই ধরনের কনটেন্টই বেশি দেখায়। গুজব, কাটা-ছেঁড়া ভিডিও, উদ্ভেজনামূলক ক্যাপশন সহজে জনপ্রিয় হয়। বাংলাদেশে ফেসবুক, ইউটিউব, টিকটক, মেসেঞ্জার বা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ অনেকের খবরের প্রধান উৎস। PIB এবং ইউনেস্কো একমত যে, নির্বাচনী সাংবাদিকতায় সত্যতা যাচাই এখন আলাদা কোনো কাজ না বরং এটাই মূল কাজ। বর্তমানে, খুব বিশ্বাসযোগ্য দেখায় এমন ভুয়া অডিও, ছবি, ভিডিও বানানো সহজ। এটি খবরের বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট করতে পারে। ইউনেস্কো তাই এআই প্রসঙ্গে সতর্ক করেছে। পিআইবি সোশ্যাল মিডিয়ায় নির্বাচনসংক্রান্ত কনটেন্ট শেয়ার বা প্রকাশের আগে সত্যতা যাচাইয়ের কথা জোর দিয়ে বলছে। এআই দিয়ে বানানো বা সম্পাদিত মিথ্যা কনটেন্ট দিয়ে ভোটারকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা ঠেকানোর নীতিও তুলে ধরেছে। ইউনেস্কোর সংঘাত সংবেদনশীল রিপোর্টিং সংক্রান্ত কাজের অভিজ্ঞতা PIB-র কাজকে শক্ত ভিত্তি দিয়েছে। নির্বাচনকালীন উদ্ভেজনা, ভয়, গুজব, আর স্থানীয় সংঘর্ষ নতুন কিছু নয়। ইউনেস্কোর মতে, রিপোর্টিং যেন সংঘাতে তেল না ঢালে। ভাষা যেন কাউকে শত্রু বানিয়ে না ফেলে। সেই আলোকে দায়িত্বশীল সংবাদ প্রচার ও ক্ষতি কমাতে PIB শব্দচয়ন, কনটেন্ট, প্রমাণ, এবং সংবেদনশীল বিষয় নিয়ে রিপোর্টিংয়ে সতর্কতা অবলম্বনের কথা বারবার মনে করিয়ে দেয়। ভালো রিপোর্টিং তখনই সম্ভব, যখন সাংবাদিক অন্তত ন্যূনতম নিরাপদ বোধ করেন। ইউনেস্কো টমা ও সেফটি বিষয়ে দেখিয়েছে, মাঠের ঝুঁকি যেমন বাস্তব, মানসিক চাপও বাস্তব। PIB এই নির্দেশিকায় নিরাপত্তাকে কাজের অংশ করেছে। ঝুঁকি মূল্যায়ন, নিয়মিত যোগাযোগ, ডিজিটাল সুরক্ষা, এসবকে পেশাদার অভ্যাস হিসেবে ধরেছে।

এই নির্দেশিকায় সাংবাদিকগণ ব্যবহারিক নির্দেশনা পাবেন। ইউনেস্কোর আন্তর্জাতিক নীতিগুলো তাদের আলোকিত করবে। PIB বাংলাদেশের আইন, প্রক্রিয়া, আর মাঠ বাস্তবতার সাথে ইউনেস্কোর নীতিগুলোকে মিলিয়ে নির্বাচন কমিশনের (ইসি) অনুমোদন নিয়ে এই নির্দেশিকা প্রস্তুত ও প্রকাশ করেছে। এই যৌথ প্রচেষ্টার লক্ষ্য হল মানুষ যেন ভয় ও বিভ্রান্তি ছাড়া, তথ্যের আলোয় সিদ্ধান্ত নিতে পারে। আর সাংবাদিকতা যেন সেই আলোর দিকেই থাকে।

নির্বাচন প্রতিবেদন নির্দেশিকা

জিয়াউর রহমান
সুলতান মাহমুদ

সম্পাদক
ফারুক ওয়াসিফ



প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

প্রকাশক
ফারুক ওয়াসিফ
মহাপরিচালক, পিআইবি

প্রকাশকাল
জানুয়ারী ২০২৬

প্রচ্ছদ ও পৃষ্ঠাসজ্জা
সৈয়দ লতিফ হোসাইন

মুদ্রণ
খড়িমাটি অ্যাড.কম
হাউজ: ১০৩৫, রোড: ৯, এভিনিউ: ৯
মিরপুর-ডিওএইচএস, ঢাকা-১২১৬

© পিআইবি কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

Published by Press Institute Bangladesh (PIB)

3 Circuit House Road, Dhaka-1000
Phone: 41032913, 41032925-6, Fax: 880-02-41032914
E-mail: research@pib.gov.bd

Website

www.pib.gov.bd,
পিআইবি.বাংলা

ভূমিকা

নির্বাচন হলো গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চালু রাখার একটি মূল ব্যবস্থা। আর গণতন্ত্রের এক অপরিহার্য অংশ হলো স্বাধীন ও দায়িত্বশীল গণমাধ্যম। নাগরিকদের সচেতনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করার ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশে একই সঙ্গে একটি ঐতিহাসিক গণভোট ও জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। কিন্তু ভোটারদের বড়ো অংশের মতো, বেশির ভাগ সাংবাদিকেরই এ ধরনের পরিস্থিতি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা নেই। কারণ গত দেড় দশকে কোনো অংশগ্রহণমূলক সত্যিকার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। সে বিচারে বলা যায়, অধিকাংশেরই নির্বাচনি কার্যক্রম বিষয়ে অংশগ্রহণমূলক অভিজ্ঞতা নেই। সেই অভাব পূরণই প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশের পক্ষ থেকে এই নির্বাচনি সাংবাদিকতাবিষয়ক নির্দেশিকা প্রকাশের কারণ।

সাংবাদিকতা শুধু একটি পেশা বা চাকরি নয়। এটি একটি দায়িত্বশীল, কল্যাণমুখী পেশা। গণমাধ্যম ও গণমাধ্যমকর্মী জনগণের কাছে বাস্তবতার বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ তৈরি করায় দায়বদ্ধ। তাই সূষ্ঠ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠায় গণমাধ্যমকর্মীর ভূমিকা অনস্বীকার্য।

বিশেষ করে, নির্বাচনের সময় গণমাধ্যমকর্মীদের চ্যালেঞ্জিং সময় পার করতে হয়। গণমাধ্যমকর্মী তথ্যের উৎস ও বাহক হিসেবে নির্বাচনি প্রক্রিয়া সম্পর্কে তথ্যপ্রমাণভিত্তিক, নিরপেক্ষ ও ভারসাম্যপূর্ণ তথ্য পরিবেশন করেন। তাঁদের কাজ কেবল ভোটারদের তথ্য প্রদানেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং নির্বাচনের বিশ্বাসযোগ্যতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করায়ও তাঁদের ভূমিকা থাকে।

খুব অল্প সময়ের মধ্যে হলেও গণমাধ্যমকর্মীদের পেশাগত সক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যে এই নির্দেশিকাটি তৈরি করা হয়েছে। তাঁরা যাতে পুরো নির্বাচনি সময়ে আরও দক্ষ, দায়িত্বশীল ও সক্ষমভাবে পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে পারেন—সেটাই এই প্রকাশনার উদ্দেশ্য। এতে রয়েছে ব্যবহারিক নির্দেশনা, নৈতিক কাঠামো এবং প্রাসঙ্গিক বিশ্লেষণ। গণমাধ্যমকর্মীদের নির্বাচনি প্রতিবেদন তৈরির জটিলতা মোকাবিলায় আশা করি এটি সহায়তা করবে। নির্বাচনি ব্যবস্থা ও প্রচারণা থেকে শুরু করে রাজনৈতিক বক্তব্য যাচাই (fact-checking) এবং বিশ্রাস্তিমূলক তথ্যের (misinformation) ব্যাপকতা রোধ-

সহ দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার জন্য প্রয়োজনীয় নানা উপকরণ ও পদ্ধতির মূল কথাগুলো এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

নির্বাচনের সময় গণমাধ্যমকর্মী কীভাবে সংবাদ পরিবেশন করবেন, ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় কীভাবে নিজে ঝুঁকিমুক্ত থেকে কাজ করবেন, ভোটকালীন প্রতিবেদনের সময় কোন কোন বিষয় খেয়াল রাখবেন বা নৈতিকতার মান বজায় রেখে কীভাবে কাজ করতে হবে—এসব কিছুই স্বল্পপরিসরে আলোকপাত করা হয়েছে এ প্রকাশনায়।

নির্বাচনি প্রক্রিয়ার বিশ্বাসযোগ্যতা অনেকাংশেই নির্ভর করে কতটা সঠিক, ভারসাম্যপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক তথ্য জনগণের কাছে পৌঁছাচ্ছে, তার ওপর। গণমাধ্যমকর্মীদের কাজ কেবল ঘটনাবলি জানানো নয়; বরং সেই ঘটনাগুলোর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা, জটিল নিয়মকানুন ও প্রক্রিয়াগুলো সহজ-সাবলীল ভাষায় উপস্থাপন করা এবং নাগরিকদের এমনভাবে তথ্য দেওয়া, যা তাদেরকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।

এই প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালটি গণমাধ্যমকর্মীদের দায়িত্ব আরও দক্ষতা ও সততার সঙ্গে পালনে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়েছে। এখানে মনোনয়ন ও প্রচারণা থেকে শুরু করে ভোটগ্রহণ এবং নির্বাচনোত্তর বিশ্লেষণ পর্যন্ত নির্বাচনি প্রতিবেদন প্রস্তুতের বিভিন্ন ধাপ নিয়ে ব্যবহারিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি এতে রাজনৈতিক দলগুলোর ইশতাহার (manifesto), প্রার্থীদের হলফনামা (affidavit), নির্বাচনি এলাকা পুনর্নির্ধারণ (delimitation of constituencies) এবং জনগণের জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয় নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। ম্যানুয়ালটি নৈতিক, ভারসাম্যপূর্ণ ও নিরপেক্ষ প্রতিবেদনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে, যা বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার মূলভিত্তি।

সবশেষে, এ ম্যানুয়াল কেবল একটি পেশাগত সহায়িকা নয়; এটি সাংবাদিকতার জনকল্যাণমূলক অঙ্গীকারেরও পুনঃপ্রতিশ্রুতি। গণমাধ্যমকর্মী যখন নির্ভুল, ন্যায়সংগত ও সাহসিকতার সঙ্গে নির্বাচন কাভার করেন, তখন তাঁরা জনগণ ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আস্থা জোরদার করেন। এর মাধ্যমে তাঁরা যেমন সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা রক্ষা করেন, তেমনই গণতন্ত্রকে আরও সুসংহত, দৃঢ় ও মজবুত করে তোলেন।

সূচিপত্র

গণতন্ত্র, নির্বাচন ও গণমাধ্যম ৫

জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট ৬

নির্বাচন ও নির্বাচন কমিশন ৭

ভোট এবং ভোটার ৯

সরাসরি ব্যালটের মাধ্যমে ১০

ডাকযোগে ভোট বা পোস্টাল ভোট ১০

আরপিও বা গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১০

রাজনৈতিক দল ও প্রার্থী ১২

নির্বাচনি ইশতাহার ১২

মনোনয়ন ১২

হলফনামা ১৩

নির্বাচন পর্যবেক্ষক ১৩

গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের আন্তর্জাতিক মানদণ্ড ১৪

স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থাপনা ১৪

নির্বাচনি আইন সঠিকভাবে প্রয়োগ ১৫

সব দল ও প্রার্থীর জন্য সমান সুযোগ ১৫

ভোটারের স্বাধীনতা ও পছন্দের সুরক্ষা ১৫

নিভুল ও অন্তর্ভুক্তিমূলক ভোটার তালিকা ১৫

স্বচ্ছ ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া: আস্থার কেন্দ্রবিন্দু ১৫

স্বাধীন গণমাধ্যমের ভূমিকা ১৫

স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের অংশগ্রহণ ১৫

নিরাপত্তা বাহিনীর নিরপেক্ষ আচরণ ১৫

স্বচ্ছ ভোটগণনা ও দ্রুত ফলাফল ঘোষণা ১৬

ক্রুত ও ন্যায়সংগত অভিযোগ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা ১৬

নির্বাচনি প্রচারণা ১৬

নির্বাচনি প্রতিবেদন ১৭

প্রাক-নির্বাচনি প্রতিবেদন ১৭

নির্বাচনি ইশতাহার ১৮

নির্বাচনকালীন প্রতিবেদন ১৮

ভোটের দিনের প্রতিবেদন ১৯

নির্বাচনোত্তর প্রতিবেদন ২০

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য নীতিমালা ২১

নির্বাচন প্রতিবেদনে নৈতিকতার প্রয়োগ ২২

সংবাদ সংগ্রহ ও সম্প্রচারে সাংবাদিকের নিরাপত্তা ২৩

রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ ২৪

বিধিমালা ২০২৫ ২৪

নির্বাচনি প্রতিবেদনে

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ২৬

তাৎক্ষণিক তথ্যপ্রাপ্তি ২৬

কুঁকি ও নৈতিক চ্যালেঞ্জ ২৬

ভুয়া খবর ২৭

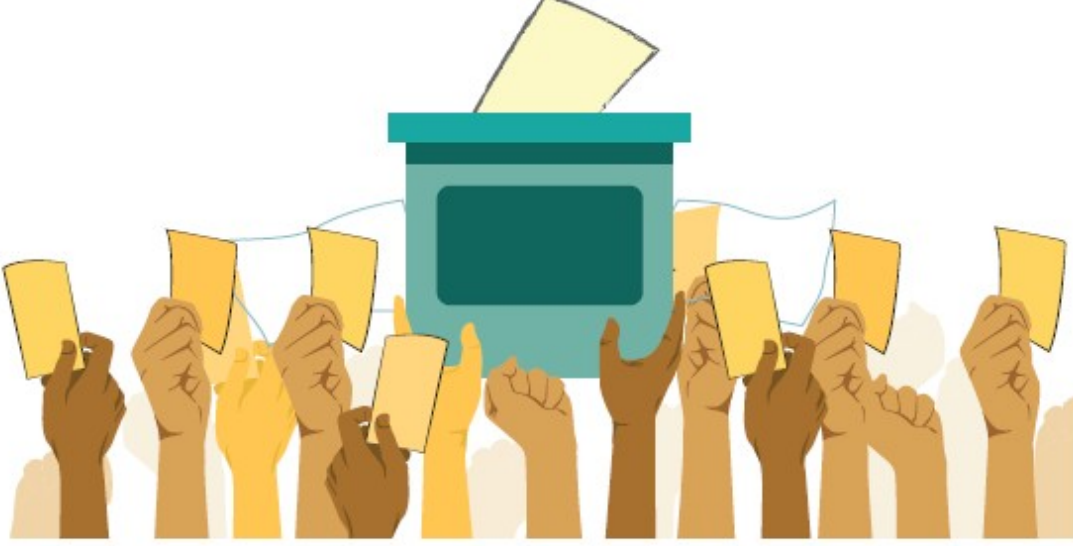
গুজব : নির্বাচন এবং সাংবাদিকতার প্রেক্ষাপটে ২৭

হেট স্পিচ ২৮

ফ্যাক্ট চেকিং এবং নির্বাচনি প্রতিবেদন ২৯

জাতীয় সংসদ নির্বাচন আইনসমূহ ৩০

গণতন্ত্র, নির্বাচন ও গণমাধ্যম



গণতন্ত্র একটি রাজনৈতিক দর্শন। এটি এমন এক শাসনব্যবস্থা, যেখানে ক্ষমতার উৎস হলো জনগণ, আর তাঁরা তাঁদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। নির্বাচন গণতন্ত্রের প্রাণশক্তি। এর মাধ্যমে নাগরিক তাঁদের নেতৃত্ব বেছে নেন। মুক্ত, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচন জনগণের মতামত প্রকাশের সুযোগ সৃষ্টি করে।

বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬৫ থেকে ৬৭ পর্যন্ত সংসদ (Parliament) ও তার গঠন, সদস্যপদ এবং অধিবেশনের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আর অনুচ্ছেদ ১১৮ থেকে ১২৬ পর্যন্ত নির্বাচন কমিশন (Election Commission) প্রতিষ্ঠা, তার ক্ষমতা, দায়িত্ব ও নির্বাচন প্রক্রিয়ার আইনানুগ দিকগুলো উল্লেখ করা আছে—এসবই অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য অপরিহার্য।

গণমাধ্যম গণতন্ত্র ও সুষ্ঠু নির্বাচনের অন্যতম স্তম্ভ। সঠিক, ভারসাম্যপূর্ণ ও সময়োপযোগী তথ্য প্রদান করে গণমাধ্যম নাগরিকদের সচেতন করে ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে। এটি সমাজের অতন্ত্র প্রহরী (Watchdog) হিসেবে কাজ করে—নির্বাচন প্রক্রিয়ার অনিয়ম, দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহার তুলে ধরে। অনুসন্ধানী প্রতিবেদন, আলোচনা ও তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে গণমাধ্যম স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও অন্তর্ভুক্তি বাড়ায়। স্বাধীন ও দায়িত্বশীল গণমাধ্যম ভিন্ন মতামতের জায়গা তৈরি করে এবং রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ন্যায্য প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করে। গণমাধ্যমকর্মী যখন নৈতিকতা, নিরপেক্ষতা ও পেশাদারি বজায় রাখেন, তখন তাঁরা শুধু পেশার সত্যতাই রক্ষা করেন না—গণতন্ত্রকেও সুসংহত করে তোলেন।

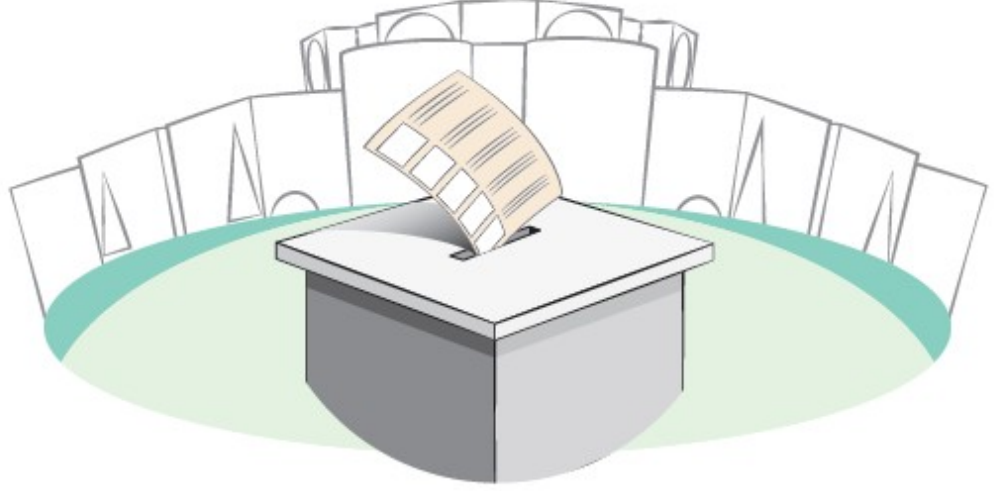
একটি মুক্ত ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত হয় সব অংশীজনের (সাংবাদিক বা গণমাধ্যমকর্মী, ভোটার, প্রার্থী, নির্বাচন কর্মকর্তা, এজেন্ট ও পর্যবেক্ষক) প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ও দায়িত্বশীল আচরণের মাধ্যমে—এখানে সবার ভূমিকাই গুরুত্বপূর্ণ। তাই সবারই উচিত সঠিকভাবে নির্বাচন আইন, বিধিবিধান ও আচরণবিধি মেনে চলা। সাংবাদিক, সরকারি কর্মকর্তা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, ভোটার ও প্রার্থী—সবার জন্যই সুনির্দিষ্ট আইন ও আচরণবিধি রয়েছে।

বক্তৃতি, নিরপেক্ষ ও ভারসাম্যপূর্ণ সংবাদের জন্য তথ্য ও চিত্র সংগ্রহের সময় গণমাধ্যমকর্মীকে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনার প্রতিও সজাগ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। স্বাধীন ও ভয়ভীতিহীন পরিবেশে ভোটাধিকার প্রয়োগ করার সুযোগ প্রত্যেক ভোটারের জন্যই প্রত্যাশিত। একইভাবে প্রার্থীদের ক্ষেত্রেও নির্বাচন আচরণবিধি, ব্যয়সীমা এবং নৈতিক মানদণ্ড অনুসরণ করা জরুরি। নির্বাচন-কর্মকর্তাদের দ্বারা ভোটগ্রহণ থেকে শুরু করে ফলাফল প্রকাশ পর্যন্ত প্রতিটি প্রক্রিয়া নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছভাবে সম্পন্ন করা সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের পূর্বশর্ত। পর্যবেক্ষক ও এজেন্টরা পুরো প্রক্রিয়াটি বাস্তবতার নিরিখে পর্যবেক্ষণ করেন এবং যথাযথভাবে উপস্থাপন করেন।

সংশ্লিষ্ট সব অংশীজন যখন প্রতিটি দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করে, তখন নির্বাচন প্রক্রিয়া আরও সুষ্ঠু, স্বচ্ছ ও বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করে। ফলে গণতন্ত্র সুদৃঢ় হয় এবং জনগণের আস্থা সুসংহত হয়।

গণতন্ত্র, নির্বাচন
ও গণমাধ্যম

জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট



জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট



স্বাধীনতাপরবর্তী
বাংলাদেশে বিভিন্ন
প্রেক্ষাপটে এ
পর্যন্ত ৩টি গণভোট
অনুষ্ঠিত হয়েছে।
আর সেগুলো
হলো:

বাংলাদেশের
রাষ্ট্রপতি আস্থা
গণভোট, ১৯৭৭

বাংলাদেশের
সামরিক শাসনের
গণভোট, ১৯৮৫

বাংলাদেশের
সাংবিধানিক
গণভোট, ১৯৯১

স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশে এ পর্যন্ত বারোটি জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং তিনটি জাতীয় গণভোট অনুষ্ঠিত হয়েছে। জাতীয় নির্বাচনের পাশাপাশি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জনমত গঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো গণভোট। রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয়ের ওপর জনগণের সমর্থন আছে কি নাই, তা যাচাইয়ের জন্য যে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয় তাকে গণভোট বলে। গণভোটে ‘হ্যাঁ’ অথবা ‘না’-তে সিল দেওয়া হয়।

গণভোট হলো কোনো নির্দিষ্ট প্রস্তাব, আইন বা রাজনৈতিক ইস্যুতে ভোটারদের সরাসরি ভোটের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়া। এখানে তাঁরা তাঁদের প্রতিনিধি বেছে নেওয়ার বদলে নীতিগত এক বা একাধিক বিষয়ে সরাসরি নিজেদের মতামত প্রকাশ করেন। এটি বাধ্যতামূলক হতে পারে, যা একটি নতুন নীতি গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় অথবা এটি একটি উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করতে পারে, যা বৃহৎ আকারের মতামত জরিপের মতো।

স্বাধীনতাপরবর্তী বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে এ পর্যন্ত ৩টি গণভোট অনুষ্ঠিত হয়েছে। আর সেগুলো হলো:

- বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি আস্থা গণভোট, ১৯৭৭
- বাংলাদেশের সামরিক শাসনের গণভোট, ১৯৮৫
- বাংলাদেশের সাংবিধানিক গণভোট, ১৯৯১

জাতীয় সংসদ নির্বাচন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতা বজায় রাখলেও এ পথচলা সবসময় নিরবচ্ছিন্ন বা বিতর্কহীন ছিল না। সময়ের প্রবাহে কিছু নির্বাচন এমনভাবে আলোচিত হয়েছে যে সেগুলো ‘রাতের ভোট’, ‘ভোটারহীন নির্বাচন’, কিংবা সাম্প্রতিক সময়ে ‘নকল’ ও ‘প্রক্সি’ নির্বাচনের মতো বিশেষণ অর্জন করেছে।

বিশেষত, সর্বশেষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পরের তিনটি নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে দেশে-বিদেশে ব্যাপক সমালোচনা হয়েছে। ২০১৪ সালে অনুষ্ঠিত দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে একতরফা ‘ভোটারহীন নির্বাচন’, ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত একাদশ জাতীয় নির্বাচনকে ‘রাতের ভোট’ এবং ২০২৪ সালে অনুষ্ঠিত দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনকে ‘ডামি’ বা ‘প্রক্সি’ নির্বাচন হিসেবে প্রত্যাখ্যান করেছে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো।

এরপর থেকে একের পর এক ঘটনায় তৎকালীন সরকারের ওপর চাপ বাড়তে থাকে। যার পরিসমাপ্তি ঘটে ২০২৪ সালের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মাধ্যমে। অবসান ঘটে দীর্ঘদিনের কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থার। শেখ হাসিনার সরকারের পতন হয়। দেশ ছেড়ে ভারতে পালিয়ে যান শেখ হাসিনা। এর পরপরই নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করে, যার মূল লক্ষ্য ছিল একটি গণতান্ত্রিক, স্বচ্ছ ও অংশগ্রহণমূলক রাষ্ট্রকাঠামো পুনর্গঠন করা।

এই প্রেক্ষাপটে ২০২৫ সালের জুলাইয়ে ‘জুলাই জাতীয় সনদ’ প্রণয়ন করা হয়, যা বাংলাদেশের সংবিধান পুনর্গঠনের জন্য একটি জাতীয় রূপরেখা হিসেবে বিবেচিত। সনদে প্রস্তাবিত হয়েছিল—

- সংসদ, বিচার বিভাগ ও নির্বাহী বিভাগের ক্ষমতার ভারসাম্য পুনর্নির্মাণ;
- নাগরিক অধিকার ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা এবং
- প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা।

এই সনদের বৈধতা এবং জনগণের অনুমোদন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার ২০২৬ সালে একটি জাতীয় গণভোটের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গণভোটের মাধ্যমে নাগরিক প্রত্যক্ষভাবে তাঁদের মতামত প্রদান করবে যে, জুলাই জাতীয় সনদের ভিত্তিতে নতুন সংবিধান বাস্তবায়িত হবে কি না।

সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এবার জাতীয় নির্বাচন ও গণভোট একই দিনে অনুষ্ঠিত হবে। গণভোট অনুষ্ঠিত হবে চারটি বিষয়ের ওপর। মোট চারটি বিষয়ের ওপর একটিমাত্র প্রশ্নে ‘হ্যাঁ’ বা ‘না’ ভোট দিয়ে জনগণ মতামত জানাবেন। যে চার বিষয়ে গণভোট হবে:

১. নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার, নির্বাচন কমিশন এবং অন্যান্য সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান জুলাই সনদে বর্ণিত প্রক্রিয়ার আলোকে গঠন করা হবে।
২. আগামী সংসদ হবে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট। জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলগুলোর প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতে ১০০ সদস্যবিশিষ্ট একটি উচ্চকক্ষ গঠিত হবে এবং সংবিধান সংশোধন করতে হলে উচ্চকক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের অনুমোদন দরকার হবে।
৩. সংসদে নারীর প্রতিনিধি বৃদ্ধি, বিরোধী দল থেকে ডেপুটি স্পিকার ও সংসদীয় কমিটির সভাপতি নির্বাচন, প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ সীমিতকরণ, রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বৃদ্ধি, মৌলিক অধিকার সম্প্রসারণ, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও স্থানীয় সরকার-সহ বিভিন্ন বিষয়ে যে ৩০টি প্রস্তাবে জুলাই জাতীয় সনদে রাজনৈতিক দলগুলোর ঐকমত্য হয়েছে, সেগুলো বাস্তবায়নে আগামী নির্বাচনে বিজয়ী দলগুলো বাধ্য থাকবে।

৪. জুলাই সনদে বর্ণিত অন্যান্য সংস্কার রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিশ্রুতি অনুসারে বাস্তবায়ন করা হবে।

নির্বাচন ও নির্বাচন কমিশন

নির্বাচন হলো একটি আনুষ্ঠানিক দলগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে একটি জনগোষ্ঠী একজন বা একাধিক ব্যক্তিকে সরকার পরিচালনার জন্য বেছে নেন। বিশ্বজুড়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সবচেয়ে বড়ো কর্মযজ্ঞ হলো নির্বাচন। নির্বাচন শুধু ভোট দেওয়া নয়। এটি জনগণের ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যম। বাংলাদেশে নির্বাচন পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি স্বতন্ত্র সংস্থা আছে যা, নির্বাচন কমিশন (Election Commission, EC) নামে পরিচিত।

এটি সংবিধান অনুযায়ী গঠিত একটি স্বাধীন সংস্থা, যা সরকারের প্রভাব থেকে মুক্ত। নির্বাচন কমিশন জাতীয় ও স্থানীয় পরিষদের নির্বাচন-সহ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় প্রায় সব স্তরের নির্বাচনের ব্যবস্থাপক। এ কারণেই নির্বাচন কমিশনকে সরকারনিরপেক্ষ ভূমিকা নিতে হয়। নির্বাচন কমিশনের ওপর সরকার যেন প্রভাববিস্তার করতে না পারে, এজন্য সাংবিধানিকভাবে এর স্বতন্ত্র পরিচালনা কাঠামো থাকে। কমিশন সাধারণত ৫ বছরের জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত থাকে এবং সংবিধান অনুযায়ী স্বাধীনভাবে কাজ করে।

বাংলাদেশে নির্বাচন কমিশন প্রধানত জাতীয় নির্বাচন, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন, স্থানীয় সরকার নির্বাচন, উপনির্বাচন (by-elections) পরিচালনা করে।

নির্বাচন কমিশনের কাঠামো

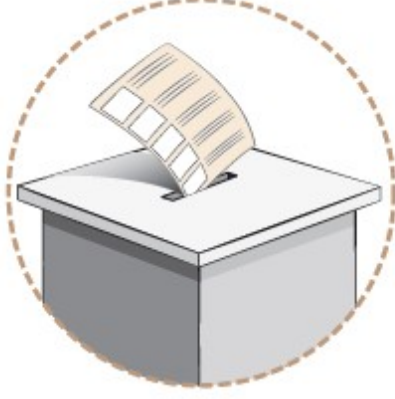
বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং সাধারণ কমিশনারদের নিয়ে গঠিত।

- প্রধান নির্বাচন কমিশনার (Chief Election Commissioner, CEC): কমিশনের সর্বোচ্চ প্রধান।
- কমিশনার (Election Commissioners): নির্বাচন কমিশন সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কমিশন সভায় প্রধান নির্বাচন কমিশনার সভাপতিত্ব করেন।
- কমিশন সাধারণত ৫ বছরের জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত থাকে এবং সংবিধান অনুযায়ী স্বাধীনভাবে কাজ করে।

নির্বাচন ও নির্বাচন কমিশন



বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার ২০২৬ সালে একটি জাতীয় গণভোটের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গণভোটের মাধ্যমে নাগরিক প্রত্যক্ষভাবে তাঁদের মতামত প্রদান করবে যে, জুলাই জাতীয় সনদের ভিত্তিতে নতুন সংবিধান বাস্তবায়িত হবে কি না।



গত বছর ৫ই আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ শাসনের পতনের এক মাস পর ৫ই সেপ্টেম্বর পদত্যাগ করেন কাজী হাবিবুল আউয়ালের নেতৃত্বাধীন নির্বাচন কমিশন। দেড় মাস শূন্য থাকার পর একই বছর ২৪শে নভেম্বর অবসরপ্রাপ্ত সচিব এএমএম নাসির উদ্দিনের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের নতুন নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়। এ নতুন নির্বাচন কমিশনের প্রথম কাজ হচ্ছে দ্রুত একটি গ্রহণযোগ্য, অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্পন্ন করা।

নির্বাচন কমিশনের প্রধান দায়িত্ব হলো:

- নির্বাচন পরিকল্পনা, সময়সূচি এবং তদারকি করা।
- ভোটার তালিকা তৈরি, হালনাগাদ ও যাচাই করা।
- প্রার্থী নির্বাচনের প্রক্রিয়া নির্ধারণ এবং প্রার্থীদের যোগ্যতা যাচাই করা।
- নির্বাচনের সময় নিরপেক্ষতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা।
- নির্বাচনে আইন ভঙ্গ হলে ব্যবস্থা নেওয়া এবং প্রার্থীদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা।
- ভোট গণনা ও ফলাফল ঘোষণা করা।
- নির্বাচনি বাজেট এবং ভোটিং ব্যবস্থার তদারকি করা।

সংবিধানের ১১৯ অনুচ্ছেদ অনুসারে নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব

১১৯। (১) রাষ্ট্রপতি পদের ও সংসদের নির্বাচনের জন্য ভোটার-তালিকা প্রস্তুতকরণের তত্ত্বাবধান, নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ এবং অনুরূপ নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং নির্বাচন কমিশন এই সংবিধান ও আইনানুযায়ী

- (ক) রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করিবেন;
 - (খ) সংসদ-সদস্যদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করিবেন;
 - (গ) সংসদে নির্বাচনের জন্য নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণ করিবেন; এবং
 - (ঘ) রাষ্ট্রপতির পদের এবং সংসদের নির্বাচনের জন্য ভোটার-তালিকা প্রস্তুত করিবেন।]
- (২) উপরি-উক্ত দফাসমূহে নির্ধারিত দায়িত্বসমূহের অতিরিক্ত যেকোনো দায়িত্ব এই সংবিধান বা অন্য কোন আইনের দ্বারা নির্ধারিত হইবে, নির্বাচন কমিশন সেইরূপ দায়িত্ব পালন করিবেন।

এরই আলোকে নির্বাচন কমিশনের কাজ হলো:

- ভোটার তালিকা প্রস্তুতি: সব নাগরিকের ভোটার পরিচয় নিশ্চিত করা।
- রাজনৈতিক দল নিবন্ধন: নির্বাচন উপলক্ষ্যে দলের ও প্রার্থীদের যোগ্যতা যাচাই ও নিবন্ধন।
- নির্বাচনি আচরণবিধি জারি: প্রার্থী ও দলের আচরণ, প্রচারণা, ব্যয়সীমা ইত্যাদির নিয়ম।
- ভোটগ্রহণ ও তদারকি: কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ, নিরাপত্তা ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার তদারকি।
- ফলাফল ঘোষণা: ভোট গণনা, ফলাফল প্রকাশ এবং কোনো বিতর্ক হলে সমাধান।
- প্রশিক্ষণ ও সচেতনতামূলক কাজ: ভোটার ও কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং সাধারণ মানুষকে ভোটের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করা।

ভোট এবং ভোটার



ভোট হলো জনগণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার, এর মাধ্যমে তাঁরা তাঁদের প্রতিনিধি বা সরকার নির্বাচন করে থাকেন। ভোটের মাধ্যমে মানুষ তাঁদের মতামত প্রকাশ, সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ এবং দেশের নীতিনির্ধারণে প্রভাব ফেলতে পারে।

ভোটার হলেন সেই ব্যক্তি, যারা নির্বাচনে অংশ নিতে ও ভোট দিতে পারবেন। ভোটাররা তাঁদের ভোটের মাধ্যমে সরকারের নেতৃত্ব নির্বাচন করেন। নির্বাচিত সরকার জনগণের পক্ষ থেকে নীতি প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

বাংলাদেশে ভোটার হতে হলে কমপক্ষে ১৮ বছর বয়স এবং বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে। এছাড়াও ভোটার তালিকায় তাঁদের নিবন্ধন থাকতে হবে এবং মানসিকভাবে সুস্থ হতে হবে, যাতে তাঁরা স্বাধীন ও সঠিকভাবে ভোট দিতে পারেন।

ভোটারের কিছু গুরুত্বপূর্ণ অধিকারও রয়েছে। তাঁরা ভোট দেওয়ার অধিকার রাখেন, এটা তাঁদের দেশের সরকার এবং নীতিনির্ধারণে সরাসরি অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে। ভোটার তথ্য পাওয়ার অধিকারও রাখেন, যাতে তাঁরা প্রার্থীদের যোগ্যতা, নীতি, পরিকল্পনা এবং অতীত কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবগত হতে পারেন। এছাড়াও ভোটার সততার সঙ্গে ভোট দেওয়ার অধিকার রাখেন, যাতে কোনো প্ররোচনা, ভয় বা জবরদস্তি তাঁদের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে না পারে। ভোটাধিকার প্রয়োগে উপযুক্ত ব্যক্তির ভোটার তালিকায় নাম থাকা এবং নির্বাচনি প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার অধিকারও সংবিধান দ্বারা নিশ্চিত।

এখানে গণমাধ্যমকর্মীদের ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভোটারদের সচেতন করার ক্ষেত্রে তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁরা ভোটের তারিখ, প্রার্থীদের তথ্য এবং নির্বাচনি নিয়ম জনগণকে জানান। গণমাধ্যমকর্মীদের কাজ হলো নিরপেক্ষ থাকা, কোনো রাজনৈতিক দল বা প্রার্থীর পক্ষে পক্ষপাত না করা। কোনো অবস্থাতেই তাঁরা অসত্য ও বিভ্রান্তিকর বা অপতথ্য প্রচার করবেন না এবং ভোটের গুরুত্ব, ভোটারের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে শিক্ষিত করা।

ভোটের অধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে গণমাধ্যমকর্মীর জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন রয়েছে, যেগুলো দায়িত্ব পালনকালে তাঁদের বিশেষভাবে বিবেচনা করা উচিত:

- ভোটার হওয়ার যোগ্য সব ব্যক্তি কি ভোটার তালিকাভুক্ত হয়েছিলেন?
- টাকা বা উপহারসামগ্রীর মাধ্যমে রাজনীতিকরা কি ভোটারদের ঘুষ দেওয়ার চেষ্টা করছেন?
- ভোটারের পছন্দকে প্রভাবিত করার জন্য তাঁদেরকে কি ভয়ভীতি বা হুমকি-ধমকি দেওয়া হচ্ছে?
- ভোটাররা কোথায় ভোট দেবেন, সে সম্পর্কে কি তাঁদের পর্যাপ্ত তথ্য দেওয়া হয়েছে?
- নারী ও সংখ্যালঘু ভোটাররা কি নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারবেন?

ভোট
এবং
ভোটার

- সব প্রার্থীর জন্য সমক্ষেত্র (লেভেল প্লেইং ফিল্ড) আছে কি না?
- সরকারি সুবিধাভোগী অতিগুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি কি নির্বাচনি প্রচারের কাজে সুবিধাগুলো ব্যবহার করছেন?
- মনোনয়নপত্র দাখিলে কি বাধা দেওয়া হয়েছে?
- উসকানিমূলক, সাম্প্রদায়িক কিংবা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানে—এমন বক্তব্য কি ভোটারদের অধিকার?

দুইটি পদ্ধতিতে ভোট গ্রহণ করা হয়।

- ১। সরাসরি ব্যালটের মাধ্যমে
- ২। ডাকযোগে ভোট বা পোস্টাল ভোট

সরাসরি ব্যালটের মাধ্যমে

সরাসরি ভোটের ক্ষেত্রে ভোটাররা নির্ধারিত প্রতীকের ঘরে সরবরাহকৃত সিলের মাধ্যমে ভোট প্রদান করে থাকেন। ভোট গ্রহণকালে কোনো ভোটারের পরিচয় সম্পর্কে কোনো পোলিং এজেন্ট নির্ধারিত পদ্ধতিতে আপত্তি উত্থাপন করলে তাকে আপত্তিকৃত ভোট বলে।

আপত্তিকৃত ভোট: কোন ব্যক্তি ভোট দানের উদ্দেশ্যে ব্যালট পেপারের জন্য আবেদন করার সময় যদি কোনো প্রার্থী অথবা তার নির্বাচনি এজেন্ট অথবা পোলিং এজেন্ট প্রিসাইডিং অফিসারের নিকট ঘোষণা করেন যে, ওই ব্যক্তি নির্বাচনে একই ভোটকেন্দ্রের বা অপর কোন ভোটকেন্দ্রে ভোট দিয়েছেন এবং তা বিশ্বাস করার জন্য যুক্তিসংগত কারণ রয়েছে, অথবা ভোটার তালিকায় লিখিত যার নামে ভোট দিতে চান তিনি ওই ব্যক্তি নন এবং তিনি যদি আদালতে এ অভিযোগ প্রমাণ করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং প্রিসাইডিং অফিসারের নিকট আপত্তিকৃত প্রতি ভোটের জন্য নগদ ১০০ (একশত) টাকা জমা দান করেন তা হলে প্রিসাইডিং অফিসার ভুয়া পরিচয় প্রদানের পরিণতি সম্পর্কে সে ভোটারকে সতর্ক করে ব্যালট পেপারে মুড়িপত্রের ওপর তার টিপসই নিয়ে এবং তিনি শিক্ষিত হলে তার দস্তখত গ্রহণ করে ওই ব্যক্তিকে ব্যালট পেপার দেবেন। এগুলো ‘আপত্তিকৃত ব্যালট পেপার’ বলে গণ্য হবে। আপত্তিকৃত ব্যালট পেপার ভোটার কর্তৃক পর্দাঘেরা কক্ষে চিহ্নিত ও ভাঁজ করার পর স্বচ্ছ ব্যালট বাগ্জে না ফেলে ওই অবস্থায় সহকারী প্রিসাইডিং অফিসারকে প্রদান করতে হবে। ওই ব্যালট পেপার তিনি ‘আপত্তিকৃত ব্যালট পেপার’ লিখিত একটি প্যাকেটে রাখবেন।

টেভার্ড ভোট: যদি কোনো ব্যক্তি ব্যালট পেপারের জন্য আবেদন করে অবগত হন যে অন্য ব্যক্তি ইতঃপূর্বে নিজেকে ওই ভোটার হিসেবে ঘোষণা করে আবেদনকারীর নামে ভোট প্রদান করেছেন তাহলে তিনি অন্য যে কোনো ভোটারের মতো একই পদ্ধতিতে ব্যালট পেপার পাবেন। এ ব্যালট পেপার ‘টেভার্ড ব্যালট পেপার’ নামে অভিহিত হবে। টেভার্ড ব্যালট পেপার স্বচ্ছ ব্যালট বাগ্জে না ফেলে প্রিসাইডিং অফিসারকে দিতে হবে। প্রিসাইডিং অফিসার ওই ব্যক্তির নাম ও ভোটারের ক্রমিক নং ফরম-১৪-তে লিপিবদ্ধ করবেন এবং তাতে ভোটারের দস্তখত বা টিপসই গ্রহণ করবেন। অতঃপর চিহ্নিত ব্যালট পেপার প্যাকেট-৬-এ রাখতে হবে। উল্লেখ্য যে, টেভার্ড ব্যালট পেপার গণনা করা যাবে না।

ডাকযোগে ভোট বা পোস্টাল ভোট

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর বিধান অনুসারে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ডাকযোগে পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগের বিধান রয়েছে। ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি যিনি তার নির্বাচনি এলাকার বাইরে চাকরিসূত্রে অবস্থান করছেন তারা পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে নির্ধারিত পদ্ধতিতে ভোট দিতে পারবেন।

এই পদ্ধতিতে প্রবাসে অবস্থানরত বাংলাদেশি ভোটাররা ভোট দেবেন। এবারই প্রথম প্রবাসী বাংলাদেশি ভোটারদের IT সাপোর্টেড পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে জাতীয় নির্বাচনে ভোটদানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। Postal Vote BD অ্যাপের মাধ্যমে বিশ্বের যেকোনো প্রান্ত থেকে ৫ জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত নিবন্ধন করার সুযোগ রাখা হয়। নিবন্ধনকৃত ভোটারদের কাছে নির্ধারিত সময়ে পোস্টাল ব্যালট পেপার পাঠানো হবে। প্রবাসীরা জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট—উভয়টিতেই ভোট দিতে পারবেন। তাছাড়া একই পদ্ধতিতে দেশের ভেতরে সরকারি চাকরিজীবী, ভোট গ্রহণ কার্যক্রমে নিয়োজিত ব্যক্তি, যারা নিজ সংসদীয় এলাকার বাইরে অবস্থান করছেন এবং যারা আইনি হেফাজতে রয়েছেন তারাও পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন।

আরপিও বা গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ

আরপিও বা গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (Representation of the People Order, 1972) হলো বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মূল আইন। বাংলাদেশে সংবিধানের আওতায় নির্বাচনসংশ্লিষ্ট যত আইন আছে, এর মধ্যে নির্বাচন পরিচালনাসংক্রান্ত মূল আইন হলো আরপিও বা গণপ্রতিনিধিত্ব আইন। এই আইনের আলোকে জাতীয় সংসদ ও স্থানীয় নির্বাচন পরিচালিত হয়। এখানে ভোটগ্রহণ, ফলাফল

ঘোষণা, নির্বাচনি অনিয়ম, প্রার্থীদের যোগ্যতা ও আচরণবিধি প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তারিত নিয়মকানুন দেওয়া আছে।

স্বাধীনতার পর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে ১৯৭২ সালে এই আইন প্রণয়ন করা হয়। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এই আইনে সংশোধনী এনে যুগোপযোগী করা হয়েছে। সর্বশেষ ৮ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও) সংশোধন করে অধ্যাদেশ জারি করেছে সরকার।

এর মাধ্যমেই ভোটার তালিকা আইন সংশোধন, নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন সংশোধন, নির্বাচন কমিশন সচিবালয় আইন সংশোধন, ভোটকেন্দ্র নীতিমালা, দেশি-বিদেশি পর্যবেক্ষণ নীতিমালা, সাংবাদিক নীতিমালাসহ সব ধরনের আইন-বিধি সংস্কার করেছে ইসি।

সংশোধিত আরপিওতে নতুন যা থাকছে

- সংশোধিত আরপিওতে আদালত ঘোষিত ফেরারি বা পলাতক আসামির প্রার্থী হওয়া ও ভোট করায় নিষেধাজ্ঞা যুক্ত হয়েছে।
- প্রায় দেড় দশক পর আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সংজ্ঞায় সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনী ফের যুক্ত হয়েছে। একক প্রার্থী থাকলে ব্যালটে ‘না’ ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।
- একাধিক রাজনৈতিক দল জোট করলেও প্রার্থীকে নিজের দলের প্রতীকেই ভোট করতে হবে—এ বিধানও এবার যুক্ত হয়েছে। এছাড়া সমসংখ্যক ভোট পেলে লটারির বদলে পুনঃভোটের সুযোগ রাখা হয়েছে।
- প্রার্থী হওয়ার যোগ্যতা, হলফনামা ও জামানত
- ১২ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, কোনো ব্যক্তি আদালত কর্তৃক ফেরারি/পলাতক ঘোষিত হলে তিনি সংসদ সদস্য হওয়ার অযোগ্য হবেন। সংশ্লিষ্ট এলাকার কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতির মতো লাভজনক পদের দায়িত্বে থাকলেও প্রার্থী হওয়া যাবে না।
- হলফনামায় দেশে-বিদেশে আয়ের উৎস উল্লেখ করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে এবং অসত্য তথ্য দিলে ভোটের পরও ইসি ব্যবস্থা নিতে পারবে। মনোনয়নপত্রের জামানত বাড়িয়ে ৫০ হাজার টাকা করা হয়েছে, তা আগে ছিল ২০ হাজার।

ভোটগ্রহণ ও প্রশাসনিক ক্ষমতা

৮ নম্বর অনুচ্ছেদে ভোটকেন্দ্র প্রস্তুতের ক্ষমতা জেলা নির্বাচন কর্মকর্তাকে দেওয়া হয়েছে। ২৫ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুসারে ভোট বিদ্যুত হলে বা ব্যালট বাস্তব ক্ষতিগ্রস্ত হলে প্রিসাইডিং অফিসার রিটার্নিং কর্মকর্তাকে জানাবেন এবং ইসি নতুন তারিখ ঘোষণা করবে। ইভিএম ব্যবহার না করার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২৬ নম্বর অনুচ্ছেদের ইভিএম সংক্রান্ত বিধান বাতিল করা হয়েছে।

প্রবাসী, কর্মস্থলবহির্ভূত সরকারি চাকরিজীবী এবং কারাবন্দিদের জন্য আইটি সাপোর্টেড পোস্টাল ভোটিং যুক্ত করা হয়েছে।

গণমাধ্যম ও পর্যবেক্ষণ

- ২৯ নম্বর অনুচ্ছেদে ভোটকেন্দ্রে গণমাধ্যমকর্মীদের প্রবেশের বিধান স্পষ্ট করা হয়েছে।
- ৩৬ নম্বর অনুচ্ছেদে ভোটগণনার সময়ও গণমাধ্যমকর্মীদের উপস্থিতির সুযোগ রাখা হয়েছে। গণনা শেষে ফল ঘোষণার আগে রিটার্নিং কর্মকর্তা প্রয়োজন মনে করলে বাতিল ব্যালট পুনরায় পরীক্ষা করতে পারবেন।
- ব্যয়, অনিয়ম ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা
- নির্বাচনি ব্যয়ের ক্ষেত্রে প্রার্থী ও রাজনৈতিক দল উভয়কে যুক্ত করা হয়েছে। ভোটারপ্রতি সর্বোচ্চ ব্যয় ১০ টাকা এবং সর্বোচ্চ মোট ব্যয় ২৫ লাখ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। অনুদানের উৎস বিস্তারিতভাবে অনলাইনে প্রকাশ বাধ্যতামূলক।
- ৭৩ নম্বর অনুচ্ছেদে মিথ্যা তথ্য, অপতথ্য, গুজব ও এআই-এর অপব্যবহার নির্বাচনি অপরাধ হিসেবে যুক্ত করা হয়েছে। ৯১ নম্বর অনুচ্ছেদ ইসিকে ক্ষমতা দিয়েছে কেন্দ্রের ভোট বাতিলের পাশাপাশি প্রয়োজনে পুরো আসনের ফল বাতিল করার। আচরণবিধি লঙ্ঘনে সর্বোচ্চ ছয় মাসের দণ্ড এবং দেড় লাখ টাকা জরিমানা নির্ধারণ করা হয়েছে; দলের ক্ষেত্রেও জরিমানার বিধান যুক্ত হয়েছে।

রাজনৈতিক দল ও প্রার্থী



রাজনৈতিক দল ও প্রার্থী

রাজনৈতিক দল জাতীয় নির্বাচন প্রক্রিয়ার একটি মৌলিক উপাদান। রাজনৈতিক দল বলতে সাধারণত একটি সংগঠিত নাগরিক সমষ্টিকে বোঝায়, যারা দলীয় আদর্শ প্রচারের মাধ্যমে জনমত গঠনের মধ্য দিয়ে বৈধ উপায়ে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রতিটি নির্বাচনে একাধিক রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে থাকে। রাজনৈতিক দলগুলোর ভিন্ন ভিন্ন প্রতীক মেনিফেস্টো ও আদর্শ থাকে। অনেক সময় একাধিক দল মিলিত হয়ে জোটের অধীনে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে।

নির্বাচনে অংশ নিতে হলে দলগুলোকে অবশ্যই সরকারিভাবে নিবন্ধিত হতে হয়। এজন্য কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত কিছু শর্ত পূরণ করতে হয়, যেমন: নির্দিষ্টসংখ্যক সদস্য থাকা, সংবিধান থাকা, কেন্দ্রীয় কার্যালয় থাকা এবং নির্বাচন কমিশনের আইনি নির্দেশিকা মেনে চলা।

নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থী ও দলের ক্ষমতা এবং তাদের অধিকারগুলো সাধারণ আচরণবিধির মধ্যে লিপিবদ্ধ থাকে। আচরণবিধিতে এ সংক্রান্ত নিয়মকানুন সংক্ষেপে লেখা থাকে। যেমন: কখন থেকে প্রচারকাজ শুরু করতে পারবে, কতদিন প্রচার চালাতে পারবে, নির্বাচনি ব্যয় কত হবে, কীভাবে এর হিসাব দাখিল করতে হবে; প্রচারসামগ্রী, পোস্টার, ব্যানার প্রভৃতি কেমন হবে—এসব বিষয় আচরণবিধিতে উল্লেখ থাকে।

যেকোনো যোগ্য নাগরিক বা রাজনৈতিক দলের মনোনীত ব্যক্তি বা নির্দলীয় কেউ নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারেন। তবে তাঁকে অবশ্যই বাংলাদেশের নাগরিক এবং ২৫ বছর বয়সি হতে হবে। একই সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের নির্ধারিত সব আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র

দাখিল এবং নির্বাচন কমিশনের যাচাই-বাছাইয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে।

নির্বাচনি ইশতাহার

নির্বাচনি ইশতাহার হলো একটি আনুষ্ঠানিক দলিল, যা কোনো রাজনৈতিক দল বা নির্বাচনি প্রার্থী প্রকাশ করে। এর মাধ্যমেই ভোটার জানতে পারবেন যে তাঁরা নির্বাচিত হলে কী কী নীতি, পরিকল্পনা, প্রতিশ্রুতি ও অগ্রাধিকার বাস্তবায়ন করবে।

এটি দল/প্রার্থীর সঙ্গে জনগণের একধরনের চুক্তি। প্রতিটি দল নির্বাচনের আগে তাদের পরিকল্পনা, নীতি-নৈতিকতা, দৃষ্টিভঙ্গি, অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি জানিয়ে ইশতাহার প্রকাশ করে। যেখানে তাঁদের আদর্শ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, পরিকল্পনা তুলে ধরা হয়। যাতে ভোটাররা তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পেতে পারেন। এর ভিত্তিতে জনগণ সিদ্ধান্ত নেন, কোন প্রার্থীকে, প্রতীকে, দলকে ভোট দেবেন বা দেবেন না। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যাভিমুখী কোনো কর্মসূচি এতে থাকে না। খুব সাধারণ ও মোটা দাগে কতগুলো জাতীয় বিষয়ে দলগুলো তাদের নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে, যেমন: বেকারত্ব, কর্মসংস্থান প্রভৃতি।

মনোনয়ন

নির্বাচনি প্রক্রিয়ার নানা ধাপের মধ্যে মনোনয়ন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের মনোনয়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই একজন আগ্রহী ব্যক্তি আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচনি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশগ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করেন। দলগুলো প্রার্থীদের জনপ্রিয়তা, যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও স্থানীয় গ্রহণযোগ্যতা বিবেচনা করে মনোনয়ন দেয়। শীর্ষ নেতৃত্ব চূড়ান্ত

প্রার্থী নির্ধারণ করে এবং দলীয় প্রতীক ব্যবহারের অনুমতি দেয়। সঠিক ও পূর্ণ দলিলপত্র জমা এবং নির্বাচন কমিশনের যাচাই প্রক্রিয়া শেষে শুধু যোগ্য ও আইনসম্মত প্রার্থীরাই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারেন। মনোনয়নসম্পূর্ণ তথ্যপ্রমাণের মধ্যে রয়েছে প্রার্থী সম্পর্কিত ব্যক্তিগত, পেশাগত, ভোটার আইডি ও রাজনৈতিক তথ্যসহ যথাযথভাবে পূরণ করা মনোনয়নপত্র।

হলফনামা

বাংলাদেশের নির্বাচন প্রক্রিয়ায় হলফনামা একটি বাধ্যতামূলক আইনি নথি, যা প্রার্থীকে মনোনয়নপত্রের সঙ্গে জমা দিতে হয়। এটি প্রার্থীর নিজের দেওয়া শপথযুক্ত ঘোষণা। যেখানে তিনি আইনি দায় স্বীকার করে বিভিন্ন তথ্য সত্য বলে ঘোষণা করেন।

হলফনামায় প্রার্থীর ব্যক্তিগত, আর্থিক, অপরাধসংক্রান্ত এবং পেশাগত তথ্যের একটি লিখিত বিবৃতি থাকে এবং তা শপথ করে সত্য বলে স্বীকার করতে হয়। নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রার্থীকে আট ধরনের তথ্য হলফনামায় জমা দিতে হয়। এসবের মধ্যে থাকে: প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা; ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত না থাকার প্রমাণপত্র; অতীতে ফৌজদারি মামলা হয়েছিল কি না, হলে এর ফলাফল কী; প্রার্থীর পেশা; প্রার্থী ও তাঁর ওপর নির্ভরশীলদের আয়ের উৎস; স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদের বিবরণ; ইতঃপূর্বে সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন কি না, হয়ে থাকলে আগে দেওয়া প্রতিশ্রুতি কতটা পূরণ করেছেন এবং ব্যাংক ঋণসংক্রান্ত তথ্য।

২০০৮ সাল থেকে অর্থাৎ, নবম ও দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীরা এ ধরনের হলফনামা জমা দেন। প্রার্থীদের সম্পত্তির অস্বাভাবিক বৃদ্ধি, শিক্ষাগত যোগ্যতায় অসামঞ্জস্যতা প্রভৃতি বিষয়ে আগের হলফনামাগুলোর সঙ্গে সাম্প্রতিক হলফনামার তথ্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে গণমাধ্যমকর্মী প্রতিবেদন করতে পারেন।

নির্বাচন পর্যবেক্ষক

নির্বাচন পর্যবেক্ষকরা একটি নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা, স্বচ্ছতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বাংলাদেশে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় ধরনের পর্যবেক্ষকই নির্বাচনসংক্রান্ত বিভিন্ন ধাপ নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেন এবং স্বাধীন মূল্যায়ন প্রদান করেন যা ভোটারদের আস্থা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে সহায়তা করে। তাদের উপস্থিতি নির্বাচনকে স্বচ্ছ ও উন্মুক্ত রাখার বেলায় বিশ্বাসযোগ্যতা সৃষ্টি করে।

নির্বাচন পর্যবেক্ষক হলেন কিছু প্রশিক্ষিত ব্যক্তি বা সংস্থার প্রতিনিধি, তারা নির্বাচন প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ না করে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করেন। তারা হতে পারেন দেশীয় অথবা আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে নির্বাচন কমিশন (ইসি) ৮১টি বেসরকারি সংস্থাকে স্থানীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষক সংস্থা হিসেবে নিবন্ধন দিয়েছে। তারা আগামী পাঁচ বছরের জন্য নিবন্ধন পেয়েছে। নিবন্ধনপ্রাপ্ত এসব সংস্থা নির্বাচন পর্যবেক্ষণ নীতিমালা-২০২৫ অনুসারে আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনসহ স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করতে পারবে। ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে নির্বাচন কমিশন সম্প্রতি ২০২৩ সালের নীতিমালা এবং তৎকালীন ৯৬টি পর্যবেক্ষক সংস্থার নিবন্ধন বাতিল করেছে।

বাংলাদেশে পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম সাধারণত ভোটের অনেক আগে থেকেই শুরু হয়। পর্যবেক্ষকরা রাজনৈতিক পরিবেশ, প্রচারণার গতিপ্রকৃতি এবং প্রশাসনিক প্রস্তুতি বিশ্লেষণ করে প্রতিদ্বন্দ্বীদের জন্য সমান সুযোগ রয়েছে কি না তা যাচাই করেন। তারা নজর রাখেন প্রার্থীরা কীভাবে প্রচারণা চালাচ্ছেন, সরকারি সম্পদের অপব্যবহার হচ্ছে কি না এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে কীভাবে আচরণ করছে। এই প্রাথমিক মূল্যায়নই অনেক সময় নির্বাচনের সুষ্ঠুতা ও প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশের প্রথম ইঙ্গিত দেয়।

ভোটের দিনে পর্যবেক্ষকরা কেন্দ্র পরিদর্শন করে পুরো প্রক্রিয়াটি সরেজমিনে দেখেন। তারা ভোটকেন্দ্র খোলার প্রক্রিয়া, কর্মকর্তাদের আচরণ, নারী, প্রবীণ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য ভোট দেওয়ার সুযোগ-সুবিধা এবং কেন্দ্রের ভেতর-বাইরের সামগ্রিক পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করেন। তাঁদের কাজ হস্তক্ষেপ করা নয়; বরং দেখা, নথিভুক্ত করা এবং মূল্যায়ন করা। তাঁদের নিরপেক্ষ উপস্থিতি অনেক সময় অনিয়ম রোধেও ভূমিকা রাখে। স্থানীয় প্রভাবশালী, দলীয় কর্মী কিংবা নির্বাচন কর্মকর্তারা পর্যবেক্ষকদের সামনে সাধারণত আরও সতর্ক আচরণ করেন।

ভোট গণনা ও ফল প্রেরণের সময়ও পর্যবেক্ষকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। বাংলাদেশে এ সময়টিতে উদ্বেজনা বাড়ার আশঙ্কা থাকে। তাই তাঁদের পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়াটিকে শান্ত ও স্বচ্ছ রাখতে সহায়তা করে। যদিও কখনো কখনো তাঁদের প্রবেশাধিকার সীমিত হয়, তবুও তাঁদের স্বাধীন নথিভিত্তিক মূল্যায়ন নির্বাচন সুষ্ঠুতা রক্ষার একটি জরুরি উপাদান।

- নির্বাচন ইশতাহার
- মনোনয়ন
- হলফনামা
- নির্বাচন পর্যবেক্ষক

গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের আন্তর্জাতিক মানদণ্ড



গ্রহণযোগ্য
নির্বাচনের
আন্তর্জাতিক
মানদণ্ড

গণতন্ত্রে নির্বাচন শুধু একটি নিয়মিত প্রক্রিয়াই নয়, এটি জনগণের আস্থার মূল ভিত্তিও বটে। একটি নির্বাচন তখনই স্বাধীন, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ, স্বচ্ছ ও বিশ্বাসযোগ্য হয়; যখন তা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানদণ্ড অনুসরণ করে পরিচালিত হয়। জাতিসংঘ (UN), ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU), কমনওয়েলথ, ইন্টার-পারলামেন্টারি ইউনিয়ন (IPU), কার্টার সেন্টারসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বহু বছরের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এসব নীতিমালা তৈরি করেছে, যা বিশ্বব্যাপী গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের একটি সর্বজনীন কাঠামো হিসেবে বিবেচিত।

নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতার আন্তর্জাতিক মানদণ্ড (International Standards for Election Credibility) বলতে এমন কিছু সর্বজনীন নীতিমালা ও শর্তকে বোঝায়, যা পূরণ হলে একটি নির্বাচনকে স্বাধীন, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ, স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য (Free, Fair, Neutral, Transparent and Credible Election) হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

আন্তর্জাতিক মানদণ্ড শুধু নির্বাচনের প্রযুক্তিগত বিষয় নয়, এগুলো হলো গণতন্ত্র রক্ষার অপরিহার্য শর্ত। প্রস্তুতি থেকে প্রচারণা, ভোটগ্রহণ, ফলাফল ও পরবর্তী বিচারিক ধাপ—প্রতিটি পর্যায়ে এই মানদণ্ডগুলো প্রযোজ্য। কোনো দেশ যখন এসব নীতি মেনে নির্বাচন পরিচালনা করে, তখন নির্বাচন শুধুই একটি নিয়মিত আয়োজন থাকে না; বরং জনগণের সত্যিকারের ইচ্ছার প্রতিফলন হয়ে ওঠে। নির্বাচনের প্রতি জনগণের আস্থাই শেষপর্যন্ত রাষ্ট্রের প্রতি তাদের আস্থা শক্তিশালী করে।

আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত এই মানদণ্ডগুলো কোনো দেশের বিরুদ্ধে চাপ নয়; বরং এগুলো সেই নীতিগুচ্ছ, যেগুলো অনুসরণ করলে জনগণের আস্থা অটুট থাকে এবং ক্ষমতার পরিবর্তন শৃঙ্খলাপূর্ণ ও বৈধ পথে সম্পন্ন হয়। একটি নির্বাচন যত বেশি স্বচ্ছ ও বিশ্বাসযোগ্য হয়, একটি দেশের গণতন্ত্র ততই দৃঢ় হয়ে ওঠে—এটাই আন্তর্জাতিক নির্বাচনি মানদণ্ডের সবচেয়ে বড়ো বার্তা।

নিচে সংক্ষেপে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মূল মানদণ্ডগুলো তুলে ধরা হলো:

স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থাপনা

নির্বাচনের বিশ্বাসযোগ্যতার কেন্দ্রবিন্দু হলো স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন। আন্তর্জাতিক মানদণ্ড বলছে, নির্বাচন কমিশনকে হতে হবে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত, সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষমতা ও সম্পদসমৃদ্ধ। একটি নিরপেক্ষ কমিশন জনগণের কাছে নির্বাচনের প্রথম আস্থার জায়গা তৈরি করে।

ভোটার তালিকা থেকে শুরু করে ভোটগ্রহণ ও ফলাফল ব্যবস্থাপনা—সব সিদ্ধান্তই রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত হতে হয়। যখন নির্বাচন ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানটি জনগণের আস্থা অর্জন করে, তখন পুরো নির্বাচনি প্রক্রিয়ার ওপরই আস্থা তৈরি হয়।

নির্বাচনি আইন সঠিকভাবে প্রয়োগ

আন্তর্জাতিক নীতিমালার এক শক্তিশালী শর্ত হলো সব দলের জন্য সমানভাবে আইন প্রয়োগ। নির্বাচনের দিন যতই ঘনিয়ে আসে, একটি প্রশ্নই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়—আইন কি ঠিকভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে? কারণ, নির্বাচনি আইনই একটি নির্বাচনের মান, মর্যাদা ও গ্রহণযোগ্যতার ভিত্তি।

যখন এই আইন কঠোরভাবে মানা হয়, তখন নির্বাচন শুধু একটি ইভেন্ট থাকে না, এটি পরিণত হয় জনগণের প্রকৃত মতামত প্রকাশের নির্ভরযোগ্য প্রক্রিয়ায়। নির্বাচনের সময় কোনো অনিয়ম, অপরাধ বা বিধিভঙ্গ হলে দ্রুত পদক্ষেপ, স্বচ্ছ তদন্ত এবং দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা জরুরি। ন্যায়সংগত আইন প্রয়োগ নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ায়।

সব দল ও প্রার্থীর জন্য সমান সুযোগ

একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের অন্যতম শর্ত হলো Level Playing Field, অর্থাৎ সব দল বা প্রার্থীর জন্য সমান সুযোগ, সরকারি সম্পদের অপব্যবহার বন্ধ এবং বিরোধী দলের ওপর দমন—পীড়নহীন পরিবেশ। এসবই আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ‘লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড’-এর মূল অংশ।

সব দল ও প্রার্থীকে প্রচার, সভা—সমাবেশ, গণমাধ্যমে উপস্থিতি—সবদিক থেকেই সমান অধিকার পেতে হবে। রাষ্ট্রীয় সম্পদ বা ক্ষমতা কোনোভাবেই সরকারি দল বা প্রার্থীর পক্ষে ব্যবহার করা যাবে না। বিরোধী দলের ওপর দমন—পীড়ন বা প্রশাসনিক বাধা থাকলে ভোটাররা সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ হারান, যা আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের পরিপন্থী। যেখানে প্রতিযোগীদের সম্মান ও অধিকার সমান, সেখানে নির্বাচনের ফলও জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়।

ভোটারের স্বাধীনতা ও পছন্দের সুরক্ষা

মুক্ত ও স্বাধীন নির্বাচন নির্ভর করে ভোটারের স্বাধীন ও ভয়হীনভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ওপর। ভোট দিতে আসার পথে কোনোরকম জুলুম, ভয়ভীতি বা চাপ প্রয়োগ আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের বিরোধী। গোপন ব্যালট নিশ্চিত করা—যেখানে কেউ বলতে পারে না ভোটার কাকে ভোট দিলেন—এটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মৌলিক উপাদান। নারী, সংখ্যালঘু, প্রতিবন্ধী এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণও সমানভাবে নিশ্চিত করতে হবে।

নির্ভুল ও অন্তর্ভুক্তিমূলক ভোটার তালিকা

একটি সঠিক, হালনাগাদকৃত ও ত্রুটিমুক্ত ভোটার তালিকা হলো আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত আরেকটি শর্ত। যদি তালিকা

ত্রুটিপূর্ণ হয়, তাহলে ভোটার বঞ্চিত হওয়ার পাশাপাশি কারচুপির সুযোগও তৈরি হয়। ত্রুটিপূর্ণ বা পক্ষপাতমূলক তালিকা নির্বাচনকে গুরুত্বের দিকে ঠেলে দেয়। তালিকাটি হতে হবে হালনাগাদ, ত্রুটিমুক্ত এবং নারী, সংখ্যালঘু, প্রতিবন্ধীসহ সব নাগরিককে অন্তর্ভুক্ত করে। এই অন্তর্ভুক্তিই নির্বাচনকে সত্যিকারের ‘সবার’ করে তোলে।

স্বচ্ছ ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া: আস্থার কেন্দ্রবিন্দু

ভোটের দিনটি একটি রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক চরিত্রের সবচেয়ে বড়ো পরীক্ষা। ভোটগ্রহণ পদ্ধতি যত স্পষ্ট হবে, জনগণের আস্থা তত বাড়বে। ভোটগ্রহণ, ব্যালট বাস্তবায়ন, ভোট গণনা—সবকিছুই পর্যবেক্ষণযোগ্য ও নথিভুক্ত হওয়া জরুরি। প্রশিক্ষিত পোলিং কর্মকর্তাদের উপস্থিতি এবং একই নিয়মে সব কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ নির্বাচনকে সুষ্ঠু ও বিশ্বাসযোগ্য করে তোলে। পরিষ্কার নিয়ম এবং সর্বজনবিদিত পদ্ধতি ভোটের দিনটিকে করে তোলে নির্ভরযোগ্য।

স্বাধীন গণমাধ্যমের ভূমিকা

গণমাধ্যমের ভূমিকা নির্বাচনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নির্বাচন তখনই গ্রহণযোগ্য হয়, যখন গণমাধ্যম স্বাধীনভাবে রিপোর্ট করতে পারে। গণমাধ্যমকর্মীদের ওপর সেলরশিপ, হয়রানি বা হামলা নির্বাচনকে অগ্রহণযোগ্য করে তোলে। মিডিয়ার ভারসাম্যপূর্ণ কাভারেজ, যাচাইকৃত তথ্য প্রচার এবং ভুল তথ্য প্রতিরোধ আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। নিয়ন্ত্রণহীন প্রচারণা যেমন বিপজ্জনক, তেমনই অন্যায্য সেলরশিপও নির্বাচনকে বিকৃত করে।

স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের অংশগ্রহণ

দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকরা নির্বাচনের ওপর জনগণের ও বিশ্বের আস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। পর্যবেক্ষকদের উপস্থিতি নির্বাচনের স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করে এবং অনিয়মকে নিরুৎসাহিত করে। তাঁদের যেন অবাধে কেন্দ্র, গণনাকক্ষ, তথ্য ও নথিপত্রে প্রবেশাধিকারের সুযোগ থাকে। পর্যবেক্ষকরা যেন বাধাহীনভাবে কাজ করতে পারেন, এটি আন্তর্জাতিক নির্বাচনি মানদণ্ডের একটি অপরিহার্য অংশ। স্বচ্ছ নির্বাচনে গোপনীয়তার প্রয়োজন নেই; বরং উন্মুক্ততা জনগণের আস্থা বাড়ায়।

নিরাপত্তা বাহিনীর নিরপেক্ষ আচরণ

ভোটের পরিবেশ শান্ত রাখা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রধান দায়িত্ব। তাদের আচরণ হতে হবে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক

গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের আন্তর্জাতিক মানদণ্ড

- স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থাপনা
- নির্বাচনি আইন সঠিকভাবে প্রয়োগ
- সব দল ও প্রার্থীর জন্য সমান সুযোগ
- ভোটারের স্বাধীনতা ও পছন্দের সুরক্ষা
- নির্ভুল ও অন্তর্ভুক্তিমূলক ভোটার তালিকা
- স্বচ্ছ ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া: আস্থার কেন্দ্রবিন্দু
- স্বাধীন গণমাধ্যমের ভূমিকা
- স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের অংশগ্রহণ
- নিরাপত্তা বাহিনীর নিরপেক্ষ আচরণ
- স্বচ্ছ ভোটগণনা ও দ্রুত ফলাফল ঘোষণা
- দ্রুত ও ন্যায়সংগত অভিযোগ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা
- নির্বাচনি প্রচারণা

প্রভাবমুক্ত, পেশাদার ও দায়িত্বশীল। ভোটারদের নিরাপত্তা নিশ্চিত এবং সহিংসতা প্রতিরোধে তাদের ভূমিকা নির্বাচনকে সুষ্ঠু রাখার অন্যতম শর্ত।

নির্বাচনি পরিবেশ নিরাপদ রাখা জরুরি, তবে এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কখনোই ভোটার বা প্রার্থীদের ওপর রাজনৈতিক প্রভাব প্রয়োগ করতে পারে না। তাদের ভূমিকা হতে হবে সম্পূর্ণ পেশাদার, ন্যায়সংগত ও আইনানুগ। নিরাপত্তা মানেই ভয়, এ ধারণা দূর করে নিরাপত্তার অনুভূতি তৈরি করাও আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের অন্যতম একটি শর্ত।

স্বচ্ছ ভোটগণনা ও দ্রুত ফলাফল ঘোষণা

ভোটগণনার ধাপটি অত্যন্ত সংবেদনশীল। ভোটগ্রহণ শেষ হলে মানুষের অপেক্ষা থাকে ফলাফলের দিকে। গণনা যেন উন্মুক্ত পরিবেশে হয়, পর্যবেক্ষক ও এজেন্টরা যেন তা দেখার সুযোগ পান—এটি আন্তর্জাতিক মান। ফলাফল ঘোষণায় অযথা সময়ক্ষেপণ অনাস্থা তৈরি করে। তাই দ্রুত, সুনির্দিষ্ট ও প্রমাণসমৃদ্ধ ফলাফল প্রদান জরুরি। প্রতিটি রেকর্ড জনসমক্ষে প্রকাশ থাকলে গুজবের সুযোগ থাকে না এবং জনগণ ফলাফল সহজে মেনে নেয়।

দ্রুত ও ন্যায়সংগত অভিযোগ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা

যে-কোনো গ্রহণযোগ্য নির্বাচনে একটি শক্তিশালী, নিরপেক্ষ অভিযোগ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা থাকতে হয়। নির্বাচনসংশ্লিষ্ট অভিযোগগুলোর নিরপেক্ষ তদন্ত এবং দ্রুত নিষ্পত্তি গ্রহণযোগ্য ফলাফলের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আদালত বা নির্বাচন সংস্থাগুলোকে দ্রুত ও ন্যায়সংগতভাবে অভিযোগ তদন্ত ও নিষ্পত্তি করতে হবে। অভিযোগ শোনা হবে এবং বিচার পাওয়া যাবে—এ বিশ্বাসই নির্বাচনি আস্থা গড়ে তোলে। অভিযোগের ন্যায্য সমাধান নির্বাচনকে স্থায়ী বৈধতা দেয়।

নির্বাচনি প্রচারণা

নির্বাচন সাংবাদিকতার সবচেয়ে বড়ো ক্ষেত্র হলো নির্বাচনি প্রচারণা। নির্বাচনি প্রচারণা মূলত সেসব কর্মসূচি ও যোগাযোগ, যার মাধ্যমে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীরা ভোটারদের কাছে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি, পরিকল্পনা এবং যোগ্যতা তুলে ধরে সমর্থন অর্জনের চেষ্টা করেন। নির্বাচনের সময় রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীরা সারাদেশে দলীয় ও ব্যক্তিগত প্রচারণা চালান। জনসভা, পথসভা, ঘরে ঘরে প্রচার, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বার্তা, গণমাধ্যমে বক্তব্য—সব মিলেই ভোটারদের সঙ্গে একটি সম্পর্ক ও আস্থা গড়ে তোলে। এটিই মূলত নির্বাচনের প্রাণ।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নির্বাচনি প্রচারণা আরও গুরুত্বপূর্ণ। দেশের বহু জনগোষ্ঠী, বিভিন্ন অঞ্চল এবং শিক্ষা ও সামাজিক বৈচিত্র্যের কারণে প্রত্যেক ভোটারের কাছে তথ্য পৌঁছে দেওয়া সহজ নয়। প্রচারণাই সেই সুযোগ তৈরি করে, যেখানে জনগণ প্রার্থীর অঙ্গীকার, দলের ঘোষণাপত্র এবং উন্নয়নের পরিকল্পনা সম্পর্কে সরাসরি জানতে পারেন। এতে ভোটারের সচেতনতা বাড়ে এবং এর মাধ্যমে ভোটারের যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা তৈরি হয়।

প্রচারণা শুধু ভোট চাওয়ার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়; এটি অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্রকে চাঙা করে। মাঠপর্যায়ে সভা, সমাবেশ, আলোচনা এবং জনগণের সঙ্গে সরাসরি কথা বলার মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলো সমাজের প্রকৃত সমস্যাগুলো বুঝতে পারে এবং ভোটারদেরও গণতন্ত্রে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করে।

বাংলাদেশে নির্বাচনি প্রচারণার আরেকটি বড়ো ভূমিকা হলো জবাবদিহি তৈরি করা। প্রার্থীরা জনগণের সামনে এসে তাঁদের পূর্ববর্তী কাজের ব্যাখ্যা দিতে বাধ্য হন, ভবিষ্যতের পরিকল্পনা স্পষ্ট করেন, আর ভোটাররা প্রশ্ন করার সুযোগ পান। এতে রাজনৈতিক স্বচ্ছতা বাড়ে।

নির্বাচনি প্রতিবেদন



সংবিধান অনুযায়ী প্রতি পাঁচ বছর পর সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও বছরজুড়েই থাকে নির্বাচনি প্রতিবেদন। সারা বছর রাজনৈতিক কার্যক্রমের মূল লক্ষ্যই থাকে নির্বাচন। ফলে সরকারি প্রচারণার অনেক আগেই শুরু হয় নির্বাচনি প্রতিবেদন। বছরজুড়েই গণমাধ্যমকর্মীরা মনোযোগ সহকারে রাজনৈতিক ঘটনার বিকাশ, সরকারের কার্যক্রম, বিরোধীদের কৌশল পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করেন এবং এসব ঘটনা পরিক্রমার ওপর নানা ধরনের প্রতিবেদন তৈরি করেন। নির্বাচনের দিন প্রতিবেদনের মূল ফোকাস থাকে ভোটার উপস্থিতি, ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া এবং নির্বাচনের ফলাফল। এরপর গণমাধ্যমকর্মীরা ফলাফলের বিশ্লেষণ, রাজনৈতিক প্রভাব ও ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনা নিয়ে রিপোর্ট তৈরি করেন।

নির্বাচন প্রতিবেদনের মাধ্যমে গণমাধ্যমকর্মীরা পাঠকের সামনে নির্বাচনি প্রক্রিয়ার সব কার্যক্রম তুলে ধরেন। এতে ভোটারদের কাছে সময়োপযোগী, সঠিক ও নিরপেক্ষ তথ্য অনেকাংশে পৌঁছে যায়। এর মধ্যে প্রার্থীর কর্মকাণ্ড, রাজনৈতিক দল, প্রচারণা, নীতি, ভোটের পদ্ধতি এবং ফলাফলসংক্রান্ত সব খবরই থাকে।

তাই সময় ও সংবাদের গুরুত্ব বিবেচনায় নির্বাচনি প্রতিবেদনকে ৩টি ভাগে ভাগ করা যায়: প্রাক-নির্বাচনি প্রতিবেদন, নির্বাচনকালীন প্রতিবেদন এবং নির্বাচন-পরবর্তী প্রতিবেদন।

প্রাক-নির্বাচনি প্রতিবেদন

সময়ের বিবেচনায় নির্বাচনের তপশিল ঘোষণার পূর্বপর্যন্ত যে প্রতিবেদন করা হয়, তাকে প্রাক-নির্বাচনি প্রতিবেদন বলা হয়। প্রাক-নির্বাচনি প্রতিবেদনে রাজনীতির সামগ্রিক গতিপ্রবাহকে বিশ্লেষণ করে ভোটারদের কাছে বাস্তবতার একটি স্পষ্ট চিত্র তুলে ধরা হয়। এতে রাজনৈতিক দল, প্রার্থী ও ইসির পাশাপাশি অর্থনীতি, প্রশাসন, সামাজিক সমস্যা, গণমাধ্যম, সামাজিক মাধ্যম, বিশেষ গোষ্ঠী, নিরাপত্তা ঝুঁকি ও নির্বাচনি ব্যয় এবং কালোটাকার ব্যবহারের মতো বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত থাকে।

এ সময়ে গণমাধ্যমকর্মীরা রাজনৈতিক পরিবেশ, দলগুলোর প্রস্তুতি, সম্ভাব্য প্রার্থীর কার্যক্রম এবং ভোটারদের মনোভাব বিশ্লেষণ করে তথ্য উপস্থাপন করেন। প্রাক-নির্বাচনি প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য হলো ভোটারদের সামনে সম্পূর্ণ চিত্র তুলে ধরা। নির্বাচনে সম্ভাব্য প্রার্থী কে বা কারা, রাজনৈতিক মাঠ কোনদিকে এগোচ্ছে, কোন বিষয়গুলো আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে এবং নির্বাচন কতটা শান্তিপূর্ণ, সুষ্ঠু কিংবা ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে—সেসব বিষয় নিয়ে প্রতিবেদন হয়ে থাকে। এছাড়াও নির্বাচনকে প্রভাবিত করতে পারে— এমন যেকোনো আইন প্রণয়ন বা সংশোধন এবং নীতিমালা বা বিধির পরিবর্তন, এসবই প্রাক-নির্বাচনি প্রতিবেদনের অংশ।

নির্বাচনি
প্রতিবেদন

এ পর্যায়ে রাজনৈতিক দলগুলোর কৌশল, সম্ভাব্য জোট গঠন, জোটে ভাঙন এবং অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব/বিরোধ গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ হয়ে ওঠে। প্রাক-নির্বাচনি সময়েই সম্ভাব্য প্রার্থীর জনপ্রিয়তা, তৃণমূল কর্মকাণ্ড, উন্নয়ন উদ্যোগ, জনসম্পৃক্ততা ও বিতর্কিত কর্মকাণ্ড নিয়ে আলোচনা শুরু হয়; যা গণমাধ্যমকর্মীদের নজর কাড়ে। প্রাক-নির্বাচনি রিপোর্টিংয়ে বিরোধী দলের সমালোচনা, সরকারের সাফল্য ও ব্যর্থতা বিশ্লেষণের মাধ্যমে একটি ভারসাম্যপূর্ণ চিত্র তুলে ধরা অত্যন্ত জরুরি।

নির্বাচনি প্রস্তুতির এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো ইলেকশন কমিশনের ভূমিকা, প্রস্তুতি এবং ইসির সার্বিক কর্মকাণ্ড। সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ তৈরিতে ইসি কতটা কার্যকর, আইনকানুন প্রয়োগ, আচরণবিধি, মনোনয়ন যাচাই-বাছাই, সীমানা নির্ধারণ, কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা, ভোটগ্রহণ প্রযুক্তি, নিরাপত্তাব্যবস্থার প্রস্তুতি, ইসির নিরপেক্ষতা নিয়ে জনমতের প্রতিক্রিয়া ও উদ্বেগও প্রতিবেদনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

ভোটের তালিকা হলো নির্বাচন যোগ্যতার মূলভিত্তি। একটি সঠিক ভোটের তালিকা নির্বাচনকে বিশ্বাসযোগ্য করে। গণমাধ্যমকর্মীরা ভোটের তালিকার হালনাগাদ অগ্রগতি, নতুন ভোটের নিবন্ধন, নারী, সংখ্যালঘু ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি বিষয়েও নানা ধরনের প্রতিবেদন তৈরি করতে পারেন। কারচুপি, মৃত ভোটের বা ভুয়া নামের অভিযোগের বিষয়ে প্রতিবেদন স্বচ্ছ নির্বাচনের ভিত্তি স্থাপন করে।

নির্বাচনি ইশতাহার

দলগুলোর ঘোষণার আগেই গণমাধ্যমকর্মীরা সম্ভাব্য ইশতাহারের দিকনির্দেশনা, পূর্ববর্তী প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন এবং ভোটদেয়দের প্রত্যাশা বিশ্লেষণ করেন। মূল বিষয়গুলো: ইশতাহার কতটা বাস্তবসম্মত, জনগণের মূল ইস্যু কতটা গুরুত্ব পাচ্ছে এবং আগের সরকারের প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন পর্যালোচনা। মনোনয়ন বাণিজ্যও হতে পারে সংবেদনশীল অনুসন্ধানী রিপোর্টিংয়ের ক্ষেত্র।

নির্বাচনকালীন প্রতিবেদন



তপাশল ঘোষণার দিন থেকে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দিন পর্যন্ত যে প্রতিবেদন হয়, একে নির্বাচনকালীন প্রতিবেদন বলা হয়। তপাশল ঘোষণার মুহূর্ত থেকেই শুরু হয় সবচেয়ে সক্রিয় ও সংবেদনশীল নির্বাচনি সাংবাদিকতা বা প্রতিবেদন তৈরির তৎপরতা। এ ঘোষণার মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং গণমাধ্যমকর্মীদের কাজও হয়ে ওঠে আরও কঠিন ও দায়িত্বশীল। এ সময়ের প্রতিটি দিন যেকোনো গণতন্ত্রের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রার্থীর মনোনয়ন দাখিল, মনোনয়ন বাছাই, প্রার্থী তালিকা প্রকাশ, বিরোধ নিষ্পত্তি, প্রতীক বরাদ্দ, প্রার্থী আচরণবিধি মেনে চলছেন কি না, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী মোতায়েন, নির্বাচনি সংঘাত প্রভৃতি প্রতিটি বিষয়ই গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাজনৈতিক দল এবং প্রার্থীর জন্যও এর প্রতিটি মুহূর্ত অত্যন্ত মূল্যবান। রাজনৈতিক দল, প্রার্থী, সাধারণ মানুষ, প্রশাসন—সবাই এ সময়টিতে গণমাধ্যমের দিকে তাকিয়ে থাকে; যা অন্য সময়ের তুলনায় গণমাধ্যমকর্মীর দায়িত্বকে অনেকগুণ বাড়িয়ে দেয়।

এ পর্যায়ে নির্বাচন কমিশনের (ইসি) ভূমিকা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। গণমাধ্যমকর্মী নিবিড়ভাবে ইসির প্রতি নজর রাখেন। ভোটকেন্দ্রের প্রস্তুতি, কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ, নিরাপত্তাব্যবস্থা, অর্থব্যয় নিয়ন্ত্রণ, এবং বিধিভঙ্গের বিরুদ্ধে ইসির পদক্ষেপের ওপর প্রতিবেদন করা হয়।

ভোটের দিন যতই কাছে আসে গণমাধ্যমকর্মী জনমত ও নির্বাচনি ইস্যুর বিশ্লেষণ করেন, প্রার্থী ও দলের শক্তি, সক্ষমতা বা দুর্বলতা তুলে ধরেন। সম্ভাব্য ঝুঁকি, সহিংসতা, ভয়ভীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার বা ভুয়া তথ্য চিহ্নিত করেন। এসব প্রতিবেদন নির্বাচন আয়োজনে সংশ্লিষ্ট সবাইকে সতর্ক করে এবং ভোটদেয়দেরও সচেতন করে।

নির্বাচনকালীন জনজীবনের নিরাপত্তার বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নির্বাচনি উত্তেজনায় শহর ও গ্রামে বিভিন্ন দল ও প্রার্থীর সমর্থকদের সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে। ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও নারী ভোটদেয়রা যাতে ভোটকেন্দ্রে যেতে না পারেন, এজন্য হুমকি দেওয়া ও ভয়ভীতি ছড়ানোর মতো ঘটনা ঘটে থাকে। গণমাধ্যমকর্মীকে এসব বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হয়।



ভোটের দিনের প্রতিবেদন

ভোটের দিন নির্বাচনি সাংবাদিকতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল পর্যায়গুলোর একটি। এদিন সারাদেশের দৃষ্টি থাকে ভোটকেন্দ্রের দিকে। এ দিনে গণমাধ্যমকর্মী ভোটার উপস্থিতি, কেন্দ্রের পরিবেশ, প্রশাসনিক প্রস্তুতি এবং যেকোনো অনিয়ম বা ঘটন নিয়ে প্রতিবেদন করেন। মূলধারার গণমাধ্যমগুলো নির্বাচনের দিন তাদের প্রায় সব প্রতিবেদককে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নির্বাচনি সংবাদ সংগ্রহে সম্পৃক্ত করে থাকে।

বিশেষ করে ভোটের দিনের শুরু থেকেই গণমাধ্যমকর্মীরা কেন্দ্রগুলো সময়মতো খুলেছে কি না, ভোটারদের উপস্থিতি কেমন, নিরাপত্তা পরিস্থিতি স্বাভাবিক কি না এবং নির্বাচন কর্মকর্তারা সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করছেন কি না, তা নিয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। দিনজুড়ে ভোটার উপস্থিতির প্রবণতা, বিভিন্ন বয়স ও শ্রেণির মানুষের অংশগ্রহণও গুরুত্বপূর্ণ সূচক হিসেবে বেতার, দৈনিক পত্রিকার অনলাইন প্ল্যাটফর্ম, অনলাইন পোর্টাল, টেলিভিশনের স্ক্রল, নিয়মিত বুলেটিনের বাইরে বিশেষ বুলেটিনেও তুলে ধরা হয়।

ভোটের দিন আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অত্যন্ত স্পর্শকাতর। গণমাধ্যমকর্মী নজর রাখেন কোথাও সংঘর্ষ, ভয়ভীতি বা কেন্দ্র দখলের চেষ্টা হচ্ছে কি না; কোনো পক্ষ ভোটারকে বাধা দিচ্ছে কি না; অথবা নির্বাচন আচরণবিধি লঙ্ঘন হচ্ছে কি না। অনিয়ম: যেমন—জাল ভোট, অনধিকার প্রবেশ বা সরকারি সুবিধার অপব্যবহারের মতো ঘটনা তাত্ক্ষণিকভাবে চিহ্নিত করে জনসমক্ষে আনা গণমাধ্যমকর্মীর অন্যতম দায়িত্ব।

এছাড়া ভোটারদের মানবিক গল্প—বয়স্ক, নারী, তরুণ বা বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ভোটারের অভিজ্ঞতা, নির্বাচনের মানসিক ও সামাজিক দিককে তুলে ধরা এবং ভোটের দিনের সম্পূর্ণ চিত্র পাঠকের কাছে পরিষ্কার করা।

এদিন বিকাল পর্যন্ত মানুষের কৌতূহল থাকে নির্বাচনটি কীভাবে সম্পন্ন হচ্ছে তা জানা। কোথাও কোনো বড়ো ধরনের সংঘাত বা প্রাণহানির মতো ঘটনা ঘটল কি না, নির্বাচনের প্রার্থীরা নির্বাচনকে কীভাবে দেখছেন—এসব কিছুই তাত্ক্ষণিক সংবাদ সরবরাহের বিষয়। দুপুরের পর থেকেই মানুষ জানতে চান, কত শতাংশ ভোট পড়েছে। সন্ধ্যা থেকেই শুরু হয় ফলাফলের জন্য অপেক্ষা।

যতক্ষণ ভোটগ্রহণ শেষ না হয় বা শেষ ভোটটি না নেওয়া পর্যন্ত নির্বাচন শেষ হয় না। ভোটগ্রহণ শেষে যখন ফল আসতে শুরু করে, প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায়—এ সময়টি নির্বাচনি প্রক্রিয়ার সবচেয়ে সংবেদনশীল।

এসময় তথ্য সরবরাহের প্রতিযোগিতায় অধিকাংশ গণমাধ্যমই আনুষ্ঠানিক ফলাফল ঘোষণার অপেক্ষায় না থেকে বেসরকারিভাবে বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে সংবাদ পরিবেশন করতে থাকে। কোন দল কতটা এগিয়ে বা পিছিয়ে, সেটাই তখন মানুষের মূল কৌতূহল থাকে। সেই কৌতূহলের খোরাক জোগাতে ব্যস্ত থাকেন গণমাধ্যমকর্মী বা নির্বাচনি সাংবাদিকতায় নিযুক্ত সাংবাদিক। এক্ষেত্রে তথ্যের প্রায় শতভাগ নিশ্চিত না হয়ে সংবাদ পরিবেশন করলে নীতিবিচ্যুতি ঘটতে পারে।

নির্বাচনোত্তর প্রতিবেদন

ভোটগ্রহণ ও ফলাফল ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে নির্বাচনি সাংবাদিকতা শেষ হয়ে যায় না। নির্বাচনোত্তর প্রতিবেদন বলতে ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার পর করা খবর, বিশ্লেষণ এবং পর্যবেক্ষণকে বোঝায়। একটি সফল নির্বাচন অনুষ্ঠান ও এর চূড়ান্ত ফল ঘোষণার পর থেকেই নির্বাচন-পরবর্তী কাভারেজের সময়সীমা শুরু হয় এবং পরবর্তী জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যন্ত এ সময়সীমা বিস্তৃত। নির্বাচন-পূর্ববর্তী সময় ও ভোটের দিনের মতোই এ সময়টি রিপোর্টারদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

নির্বাচন ফলাফল ব্যাখ্যা থেকে শুরু করে পুরো প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা মূল্যায়ন, রাজনৈতিক ও জনসাধারণের প্রতিক্রিয়া তুলে ধরা, কোনো অনিয়ম বা অভিযোগের খবর প্রকাশ এবং নির্বাচনের পর রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রভাব বিশ্লেষণও এর অন্তর্ভুক্ত।

নির্বাচন কমিশন সাধারণত ভোটের দিন শেষ হওয়ার পর প্রাথমিক ব্রিফিং দেয়। কোথাও কোনো অনিয়ম ঘটেছে কি না, কোথাও ভোট স্থগিত হয়েছে কি না, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কেমন কাজ করেছে—এসব বিষয়ে কমিশনের বক্তব্য নির্বাচনোত্তর প্রতিবেদনে গুরুত্বপূর্ণ স্থান পায়। তারা পুনর্গণনা বা পুনঃভোট নিয়ে নির্দেশনা দিলে তা বিশেষ নজর কাড়ে। এছাড়াও রয়েছে নির্বাচনি ফলাফল গ্রহণ-বর্জনের ওপর প্রতিবেদনসহ ফলাফলের গেজেট প্রকাশ, উপনির্বাচন, নতুন সরকার গঠন প্রভৃতি।

নির্বাচন-পরবর্তী প্রতিবেদনের মূল বিষয় হওয়ার কথা সদ্যসম্পন্ন নির্বাচন বিভিন্ন আঙ্গিকে মূল্যায়ন করা। কিন্তু বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে নির্বাচন-পরবর্তী রিপোর্টিংয়ের মূল বিষয় হয়ে উঠে নির্বাচন শেষে রাজনৈতিক সহিংসতা। কোনো কোনো এলাকায় বিজয়ী বা পরাজিত পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে, সংঘর্ষের খবর আসে, আহত বা হতাহত হওয়ার ঘটনাও ঘটে। অনেক সময় ভোটকেন্দ্র দখল, ব্যালট ছিনতাই,

এজেন্টদের ওপর হামলা। গণমাধ্যমকর্মীকে এখানে খুব সাবধানতা ও দায়িত্বশীলতার সঙ্গে কাজ করতে হয়, যাতে কোনো অবস্থাতেই তাঁর রিপোর্টের কারণে সংবেদনশীল পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত না হয়ে ওঠে।

নির্বাচন শেষে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সামনে আসে, আর সেটি হলো নির্বাচনি ব্যয়ের হিসাব। প্রার্থী আইনসিদ্ধ সীমার মধ্যে প্রচারণা চালিয়েছেন কি না, কোথাও কালোটাকা বা অবৈধ অর্থের প্রবাহ ছিল কি না, মাঠপর্যায়ের ব্যয় এবং প্রার্থীদের ঘোষিত ব্যয়ের মধ্যে কোনো অমিল আছে কি না—এসব প্রশ্ন নির্বাচনোত্তর অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের মূল অংশ হয়ে ওঠে।

ফলাফল ঘোষণা হয়ে গেলে শুরু হয় নতুন আরেকটি অধ্যায়। কোন দল কোথায় শক্তিশালী হলো, কোথায় দুর্বল হলো, ভোটারদের মনোভাব কোনদিকে ঝুঁকল, এর বিশ্লেষণ। গণমাধ্যমকর্মী বুঝতে চেষ্টা করেন কেন কোনো অঞ্চলে ভোটার আচরণ পালাটে গেল, কোথায় নতুন জোট তৈরি হলো বা ভেঙে গেল। এরপর শুরু হয় সরকার গঠনের রাজনৈতিক আলোচনা। জোট হবে কি না, কারা মন্ত্রিসভায় যাচ্ছেন, নতুন সরকারের নীতি কী হতে পারে—এসব ঘটনার ধারাবাহিকতা।

একই সঙ্গে আরেকটি বড়ো প্রশ্ন উঠে আসে—জনসাধারণ নির্বাচনের ফল নিয়ে কতটা সন্তুষ্ট? কোথাও ক্ষোভ আছে কি না? কোনো সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী নিজেদের বঞ্চিত মনে করছে কি না? নাগরিক সমাজ, বিশেষজ্ঞ ও বিশ্লেষকদের প্রতিক্রিয়াও তখন সংবাদে জায়গা পায়।

সব মিলিয়ে নির্বাচনোত্তর প্রতিবেদন শুধু একটি ফলাফল ঘোষণার গল্প নয়; এটি দেশের গণতন্ত্র, রাজনীতি, প্রশাসন, নিরাপত্তা, অর্থনীতি, সমাজ এবং ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশ—সবকিছুরই সম্মিলিত প্রতিচ্ছবি।

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য নীতিমালা



নির্বাচনের সময় গণমাধ্যমকর্মী গণতন্ত্রের অন্যতম রক্ষক হিসেবে কাজ করেন। সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে, বস্তুনিষ্ঠ ও বিশ্বাসযোগ্য সংবাদ পরিবেশ নিশ্চিত করতে গণমাধ্যমকর্মীকে কিছু নির্দিষ্ট নীতিমালা মেনে চলতে হয়।

তাই ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য নির্বাচন কমিশন অতীতের নীতিমালায় সংশোধনী এনেছে। সংশোধিত নীতিমালা অনুযায়ী, ভোটের দিন গণমাধ্যমকর্মীরা যাতায়াতে মোটরসাইকেল ব্যবহার করতে পারবেন। ভোটকেন্দ্র থেকে ভোটসংক্রান্ত খবর সরাসরি সম্প্রচারও করা যাবে। তবে ভোটকক্ষ থেকে সরাসরি সম্প্রচার ও গোপন কক্ষের ভেতরে ছবি তোলা যাবে না।

নতুন এই নীতিমালা অনুযায়ী, নির্বাচনের এক সপ্তাহ আগে আবেদন বিবেচনায় সংশ্লিষ্ট গণমাধ্যমকর্মীকে পাস কার্ড, গাড়ি ও মোটরসাইকেলের স্টিকার দেবে ইসি সচিবালয় ও রিটার্নিং কর্মকর্তা।

সংসদ ও স্থানীয় নির্বাচনের জন্য এ নীতিমালা অনুযায়ী অনুমোদিত প্রিন্ট, টেলিভিশন, অনলাইন নিউজ পোর্টাল,

আইপিটিভি, ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক, আন্তর্জাতিক সংস্থা, বিদেশি গণমাধ্যমকর্মীদের কার্ড ও গাড়ির স্টিকার দেওয়া হবে।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে এই নীতিমালা জারি করা হলেও ভবিষ্যতে স্থানীয় সরকারের জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন, পৌরসভা ও সিটি করপোরেশন নির্বাচনেও এই একই নীতিমালা প্রযোজ্য হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

যা করা যাবে এবং করা যাবে না

- ভোটের সময় বৈধ কার্ডধারী গণমাধ্যমকর্মী সরাসরি ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারবেন।
- প্রিসাইডিং অফিসারকে অবহিত করে তথ্য, ছবি ও ভিডিও নিতে পারবেন।
- গোপন কক্ষের ছবি তোলা যাবে না।
- একসঙ্গে দুটির বেশি প্রতিষ্ঠানের কর্মী ভোটকক্ষে যেতে পারবেন না।
- ১০ মিনিটের বেশি ভোটকক্ষে অবস্থান করতে পারবেন না।

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য নীতিমালা

নির্বাচন প্রতিবেদনে নৈতিকতার প্রয়োগ

- যথার্থতা ও সত্যনিষ্ঠতা
- নিরপেক্ষতা ও পক্ষপাতহীনতা
- সত্যতা ও স্বচ্ছতা
- নির্বাচনি প্রক্রিয়ার প্রতি প্রজ্ঞাশীল থাকতে হবে
- সংবেদনশীলতা ও ব্যক্তিগত তথ্যের সুরক্ষা
- দায়িত্বশীল ও সুষ্ঠু-সুশৃঙ্খল রিপোর্টিং
- সত্যনিষ্ঠ প্রতিবেদন নিশ্চিত করা
- জবাবদিহি
- ভোটারের নিরাপত্তা ও অধিকার রক্ষা
- ফলাফল পরিবেশনে সতর্কতা
- ভোটকেন্দ্রে নীতিমালা অনুসরণ

- ভোটকক্ষে সাক্ষাৎকার নেওয়া যাবে না।
- ভোটকক্ষের ভেতর থেকে সরাসরি সম্প্রচার করা যাবে না।
- সরাসরি সম্প্রচার করতে হলে ভোটকক্ষ থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখতে হবে।
- ভোটগণনার সময় থাকতে পারবেন, ছবি তোলা যাবে; কিন্তু সরাসরি সম্প্রচার করা যাবে না।
- ভোটকক্ষ থেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচার করা যাবে না।
- কেন্দ্রের ভোটগ্রহণ কার্যক্রম ব্যাহত হয় এমন সব কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে।
- কোনো প্রকার নির্বাচনি উপকরণ স্পর্শ বা অপসারণ করতে পারবেন না।
- নির্বাচনি সংবাদ সংগ্রহের সময় প্রার্থী বা কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষ বা বিপক্ষ অবলম্বন করা বা বিদ্বেষমূলক প্রচারণা হতে বিরত থাকবেন।
- নির্বাচন অনুষ্ঠানে সহায়তার জন্য নির্বাচনি আইন ও বিধিবিধান মেনে চলবেন।

নির্বাচন প্রতিবেদনে নৈতিকতার প্রয়োগ

নৈতিক সাংবাদিকতা শুধু পেশাগত দায়িত্ব নয়, এটি গণতন্ত্রের অপরিহার্য শর্ত। বিশেষ করে নির্বাচনের সময় সত্যনিষ্ঠ, নিরপেক্ষ ও দায়িত্বশীল প্রতিবেদন জনগণের সিদ্ধান্ত গ্রহণকে সঠিক পথে পরিচালিত করে।

নির্বাচনকালে রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা বাড়ে, উত্তেজনা তৈরি হয় এবং গুজব, প্রোপাগান্ডা ও ভুল তথ্য দ্রুত ছড়ায়। ভোটারদের প্রত্যাশাও বেশি থাকে। আর নৈতিক সাংবাদিকতা হলো এমন নীতি ও মানদণ্ড, যা গণমাধ্যমকর্মীকে সত্যনিষ্ঠ, নিরপেক্ষ, সং ও দায়িত্বশীল আচরণের দিকনির্দেশনা দেয়। সাংবাদিকতার ভিত্তি হলো বিশ্বাস; নৈতিকতার অভাব পেশাকে যেমন ক্ষতিগ্রস্ত করে, তেমনই গণতন্ত্রকেও দুর্বল করে। তাই এই সময়ে নৈতিকতার চর্চায় আরও দায়িত্বশীল ও যত্নবান হওয়া জরুরি।

যথার্থতা ও সত্যনিষ্ঠতা

সঠিক তথ্য যাচাই করে প্রতিবেদন করা এবং বিভ্রান্তিকর উপস্থাপন এড়িয়ে চলা। গুজব, অনুমান বা সন্দেহজনক তথ্য কোনো অবস্থায়ই সংবাদ হিসেবে দেওয়া যাবে না। সূত্র স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

- **নিরপেক্ষতা ও পক্ষপাতহীনতা**
গণমাধ্যমকর্মীকে কোনো রাজনৈতিক দল বা প্রার্থীর প্রতি পক্ষপাত দেখানো উচিত নয়। সব দলের বক্তব্য এবং ভিন্নমতও সমানভাবে তুলে ধরতে হবে।
- **সততা ও স্বচ্ছতা**
ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে উঠে সংবাদ প্রকাশ করতে হবে। অস্বচ্ছ, অস্পষ্ট, আংশিক কোনো তথ্য প্রকাশ করা যাবে না। তথ্যের উৎস, তথ্য সংগ্রহ ও প্রতিবেদনের পদ্ধতি জনগণের কাছে স্পষ্ট থাকা উচিত।
- **নির্বাচনি প্রক্রিয়ার প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ থাকা**
ভোট, গণনা বা প্রচারণার কাজে হস্তক্ষেপ করা যাবে না। নির্বাচন কমিশনের আইন, আচরণবিধি ও নির্দেশিকা মেনে চলা বাধ্যতামূলক।
- **সংবেদনশীলতা ও ব্যক্তিগত তথ্যের সুরক্ষা**
বিশেষত শিশু, নারী ও সংখ্যালঘু ভোটারদের তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে। রিপোর্টিংয়ের জন্য অপ্রয়োজনীয় প্রার্থীর এমন কোনো ব্যক্তিগত তথ্যও প্রকাশ করা যাবে না।
- **দায়িত্বশীল ও সুষ্ঠু-সুশৃঙ্খল রিপোর্টিং**
বিদ্বেষপূর্ণ, নেতিবাচক ও উত্তেজনাপূর্ণ কোনো ভাষা ব্যবহার করা যাবে না। এমন সংবাদ প্রকাশ করা যাবে না, যা সহিংসতা বা উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারে। সোশ্যাল মিডিয়ায়ও একই মানদণ্ড বজায় রাখতে হবে।
- **সত্যনিষ্ঠ প্রতিবেদন নিশ্চিত করা**
গণমাধ্যমকর্মীর উচিত রাজনৈতিক, আর্থিক ও ব্যক্তিগত প্রভাব ও চাপমুক্ত থেকে সত্যনিষ্ঠ প্রতিবেদন নিশ্চিত করা। স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ কাভারেজ নিশ্চিত করতে স্বতন্ত্রতা অপরিহার্য।
- **জবাবদিহি**
ভুল হলে দ্রুত সংশোধন করা এবং জনতার কাছে দায়বদ্ধ থাকা। এতে সংবাদমাধ্যমের প্রতি জনগণের আস্থা বেড়ে যায়।
- **ভোটারের নিরাপত্তা ও অধিকার রক্ষা**
উসকানিমূলক, বিভাজনমূলক বা উত্তেজনা তৈরি করে এমন সংবাদ এড়ানো। সাংবাদিকতার লক্ষ্য হওয়া উচিত শান্তি বজায় রাখা এবং ভোটারের আস্থা রক্ষা।

- ফলাফল পরিবেশনে সতর্কতা
ভোটগণনা চলাকালে অগ্রিম জয় ঘোষণা করা যাবে না। তথ্যপ্রমাণ ছাড়া অনুমান করা বিপজ্জনক।
- ভোটকেন্দ্রে নীতিমালা অনুসরণ
গোপনীয়তা, নিরাপত্তা এবং নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা মেনে চলা জরুরি।

সংবাদ সংগ্রহ ও সম্প্রচারে সাংবাদিকের নিরাপত্তা



বাংলাদেশে নির্বাচনের সময় প্রায়ই সহিংসতা, সংঘর্ষ ও উদ্বেজনায় ভরে ওঠে। এসব পরিস্থিতিতে মাঠপর্যায়ে কাজ করতে গিয়ে গণমাধ্যমকর্মী প্রায়ই শারীরিক আক্রমণ, হুমকি, হয়রানি, সরঞ্জাম ভাঙচুর এবং তথ্য সংগ্রহে বাধার মতো নানা ধরনের ঝুঁকির সম্মুখীন হন। তাঁদের নিরাপত্তা শুধু ব্যক্তিগত সুরক্ষার জন্য নয়, জনগণের সঠিক, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ তথ্য পাওয়ার অধিকার রক্ষার জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই আগাম ঝুঁকি মূল্যায়ন, সতর্কতা এবং সঠিক পদক্ষেপ অত্যন্ত জরুরি।

প্রধান ঝুঁকিসমূহ

- রাজনৈতিক সংঘর্ষ ও সহিংসতা;
- দলীয় কর্মীদের দ্বারা আক্রান্ত অথবা বাধাগ্রস্ত হওয়া;
- ক্যামেরা, মোবাইল ফোন-সহ মূল্যবান সরঞ্জাম ভাঙচুর ও ছিনতাই;
- আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বাধা বা অতিরিক্ত কড়াকড়ি;
- অনলাইন হয়রানি, ভূয়া তথ্য, ডিজিটাল নজরদারি এবং
- ভিডেও চাপে আটকে পড়া বা ঘিরে ফেলা।

ঝুঁকি মূল্যায়ন

নির্বাচনি সংবাদ সংগ্রহ বা শুরু করার আগে গণমাধ্যমকর্মীর করণীয়:

- ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা চিহ্নিত করা: আগের নির্বাচনে সহিংসতার ইতিহাস, স্থানীয় বিরোধ, দলীয় দখল প্রভৃতি বিবেচনায় নেওয়া।
- স্টেকহোল্ডার বিশ্লেষণ: কোন এলাকায় কোন গ্রুপ কতটা প্রভাবশালী ও আক্রমণাত্মক হতে পারে, তা বোঝা।
- সম্ভাব্য ট্রিগার পয়েন্ট শনাক্ত করা: ভোটকেন্দ্রে লম্বা লাইন, ফল ঘোষণায় বিলম্ব, রাতে ভোট গণনা, কেন্দ্র দখল—এগুলো ঝুঁকি বাড়ায়।
- যোগাযোগ ও পরিবহণ পরিকল্পনা: যাতায়াতের নিরাপদ পথ, বিকল্প রুট ও জরুরি সহায়তার উৎস নির্ধারণ করা।
- ডিজিটাল নিরাপত্তা মূল্যায়ন: অনলাইন ট্রলিং, নজরদারি বা হ্যাকিংয়ের আশঙ্কা বিবেচনা করা।

ঝুঁকি মোকাবিলা ও প্রতিকার

- ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় দলগতভাবে সংবাদ সংগ্রহ করা।
- আগে থেকেই নিরাপদ অবস্থান নির্বাচন করা, যেখান থেকে দূরত্ব বজায় রেখে ছবি/তথ্য সংগ্রহ করা যায়।
- নিউজরুমের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ বজায় রাখা এবং লাইভ লোকেশন শেয়ার করা।
- সহিংসতার শঙ্কা দেখা দিলে তাৎক্ষণিকভাবে সরে যাওয়া, কোনো অবস্থায়ই অতিমাত্রায় ঝুঁকি নেওয়া যাবে না।
- আইনি সহায়তা ও নেটওয়ার্ক তৈরি করা—অফিস, স্থানীয় প্রেস ক্লাব, সাংবাদিক সংগঠন, মানবাধিকার সংগঠন, আইনজীবী—এ ধরনের পেশাজীবীদের সঙ্গে সম্পর্ক ও যোগাযোগ রাখা।
- ডিজিটাল নিরাপত্তা বাড়াতে এনক্রিপ্টেড অ্যাপ ব্যবহার, পাসওয়ার্ড ম্যানেজমেন্ট ও দ্বিস্তরের নিরাপত্তা সক্রিয় করা।
- আহত বা বিপদে পড়লে দ্রুত হাসপাতাল, থানা বা জরুরি সেবা নেওয়া।

সংবাদ সংগ্রহ ও সম্প্রচারে সাংবাদিকের নিরাপত্তা

প্রয়োজনীয় করণীয়

- নিরপেক্ষতা ও দৃশ্যমান প্রেস আইডি বজায় রাখা।
- যথাযথভাবে, প্রয়োজনে কয়েকবার যাচাই করে সঠিক তথ্য প্রকাশ।
- কী শব্দ শব্দ হলে কৌশল পরিবর্তন।
- জরুরি সরঞ্জাম (ফাস্ট-আইডি, পাওয়ারব্যাংক, আইডি) সঙ্গে রাখা।

যা এড়িয়ে চলতে হবে

- সহিংস ভিড়ের কেন্দ্রবিন্দুতে যাওয়া।
- উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে তর্কে জড়ানো।
- অবিশ্বস্ত সূত্র ও তথ্যের ওপর নির্ভর করে রিপোর্ট করা।
- রাজনৈতিক লোগো, ব্যক্তির ছবি, প্রতীক মুদ্রিত ক্যাপ, টি-শার্ট, কোনো চিহ্ন বা রং বহন করা।

রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা ২০২৫

আরপিওর সর্বশেষ সংশোধনীতে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণবিধিতেও উল্লেখযোগ্য সংশোধন ও সংযোজন করা হয়েছে। ১১ নভেম্বর নির্বাচন কমিশন ‘রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা ২০২৫’ জারি করে। নতুন বিধান অনুযায়ী আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রচারে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীরা কোনো প্রকার পোস্টার ব্যবহার করতে পারবেন না। পাশাপাশি ড্রোনও ব্যবহার করা যাবে না। এছাড়া থাকছে বিদেশে প্রচারণায় নিষেধাজ্ঞা।

এছাড়াও দল এবং প্রার্থীদের প্রচারণায় কী কী করা যাবে এবং কী কী করা যাবে না, এর সবই উল্লেখ রয়েছে এই সংশোধিত বিধিমালায়। এতে অনলাইনে ভোটের প্রচারের বিষয়েও বলা আছে। নির্বাচনি আচরণবিধি ভাঙলে প্রয়োজনে তদন্তসাপেক্ষে প্রার্থিতা বাতিলের ক্ষমতাও রয়েছে এতে।

এছাড়া প্রার্থীর আচরণবিধি লঙ্ঘনে সর্বোচ্চ ছয় মাসের কারাদণ্ড ও দেড় লাখ টাকা জরিমানা এবং দলের জন্য দেড় লাখ টাকা অর্থদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে।

নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিদেশে জনসভা, পথসভা, সভা-সমাবেশ বা কোনো প্রচারণা করা যাবে না। নির্বাচনের দিন ও প্রচারের সময় কোনো ধরনের ড্রোন, কোয়ার্ডকন্টার বা এ জাতীয় যন্ত্র ব্যবহার করা যাবে না।

প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাঁর পক্ষে অন্য কোনো প্রার্থী ও প্রতিষ্ঠান ভোটের স্লিপ বিতরণ করতে পারবে। তবে ভোটের

স্লিপে প্রার্থীর নাম, ছবি, পদের নাম ও প্রতীক উল্লেখ করতে পারবে না।

সরকারি সুবিধাভোগী অতিগুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত/তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা, উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যদেরও যোগ করা হয়েছে। ফলে তাঁরা প্রার্থীর হয়ে প্রচারে নামতে পারবেন না।

প্রচারে পরিবেশবান্ধব সামগ্রী ব্যবহারে জোর দেওয়া হয়েছে; প্রচারসামগ্রীতে পলিথিন, রেকসিন ব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। যন্ত্রের মাধ্যমে প্রচারের সময় শব্দের মাত্রা ৬০ ডেসিবলে রাখতে হবে।

আচরণবিধির ‘গুরুতর’ অপরাধের ক্ষেত্রে আরপিওতে প্রার্থিতা বাতিলের বিধান রয়েছে। আগে আচরণবিধিতে আরপিও অনুচ্ছেদটি ছিল না, এবার যুক্ত করা হয়েছে। নির্বাচনি অপরাধে আরপিও ৯১ ধারা অনুযায়ী প্রার্থিতা বাতিল করে থাকে ইসি। বিষয়টি আচরণ বিধিমালায় স্পষ্ট করা হয়েছে।

গণমাধ্যমের সংলাপ ও সব প্রার্থীর এক মঞ্চে ইশতাহার ঘোষণার সুযোগ রাখা হয়েছে। রিটার্নিং কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট আসনে সব প্রার্থীকে নিয়ে একদিনে তাঁদের ইশতাহার বা ঘোষণাপত্রগুলো পাঠ করার ব্যবস্থা করবেন।

প্রথমবারের মতো আইটি সাপোর্টেড পোস্টাল ভোটিং পদ্ধতি চালু করা হয়েছে এবার। দেশের ভেতরে তিন ধরনের ব্যক্তি ও প্রবাসী বাংলাদেশি ভোটাররা পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিতে পারবেন।

যা আছে আচরণ বিধিমালায়

- সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নির্বাচনি প্রচারণা: কোনো প্রার্থী বা তাঁর নির্বাচনি এজেন্ট বা পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করে নির্বাচনি প্রচার-প্রচারণা পরিচালনা করতে পারবেন। তবে এক্ষেত্রে প্রার্থী বা তাঁর নির্বাচনি এজেন্ট বা দল বা প্রার্থীসংশ্লিষ্ট সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের নাম, অ্যাকাউন্ট আইডি, ই-মেইল আইডিসহ অন্যান্য শনাক্তকরণ তথ্যাদি উজ্জ্বলপে প্রচার-প্রচারণা শুরুর পূর্বে রিটার্নিং অফিসারের কাছে দাখিল করতে হবে;
- প্রচার-প্রচারণাসহ নির্বাচনসংশ্লিষ্ট কোনো বিষয়ে অসদুদ্দেশ্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ব্যবহার করা যাবে না;
- ঘৃণাত্মক বক্তব্য, ভুল তথ্য, কারও চেহারা বিকৃত করা, নির্বাচনসংক্রান্ত বানোয়াট



প্রার্থীর আচরণবিধি লঙ্ঘনে সর্বোচ্চ ছয় মাসের কারাদণ্ড ও দেড় লাখ টাকা জরিমানা এবং দলের জন্য দেড় লাখ টাকা অর্থদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে

তথ্যসহ সব ধরনের ক্ষতিকর কনটেন্ট বানানো ও প্রচার করা যাবে না;

- প্রতিপক্ষ, নারী, সংখ্যালঘু বা অন্য কোনো জনগোষ্ঠীকে লক্ষ্য করে ঘৃণাত্মক বক্তব্য, ব্যক্তিগত অক্রমণ বা উসকানিমূলক ভাষা ব্যবহার করা যাবে না; নির্বাচনি স্বার্থ হাসিল করার জন্য ধর্মীয় বা জাতিগত অনুভূতির অপব্যবহার করা যাবে না; সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নির্বাচনসংক্রান্ত সব কনটেন্ট শেয়ার ও প্রকাশ করার আগে সত্যতা যাচাই করতে হবে;
- রাজনৈতিক দল, প্রার্থী বা প্রার্থীর পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি ভোটদানের বিভ্রান্ত করার জন্য কিংবা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে কোনো প্রার্থী বা ব্যক্তির চরিত্রহনন কিংবা সুনাম নষ্ট করার উদ্দেশ্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম বা অন্য কোনো মাধ্যমে সাধারণভাবে বা সম্পাদন (Edit) করে কিংবা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা তথা Artificial Intelligence (AI) দ্বারা কোনো মিথ্যা, বিভ্রান্তিকর, পক্ষপাতমূলক, বিদ্বেষপূর্ণ, অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ এবং মানহানিকর কোনো আদ্যে (content) তৈরি, প্রকাশ, প্রচার ও শেয়ার করতে পারবেন না।
- গুজব ও এআই-এর অপব্যবহার বন্ধে নির্বাচনি অপরাধ বিবেচনায় শাস্তির বিধান রেখে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশে এবার নতুন ধারা যুক্ত করা হয়।
- কোনো দল বা প্রার্থী নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিদেশে জনসভা, পথসভা, সভা-সমাবেশ বা কোনো প্রচারণা করতে পারবে না।
- ভোটের প্রচারে থাকছে না পোস্টারের ব্যবহার। একজন প্রার্থী তাঁর সংসদীয় আসনে ২০টির বেশি বিলবোর্ড ব্যবহার করতে পারবে না; যার দৈর্ঘ্য হবে সর্বোচ্চ ১৬ ফুট আর প্রস্থ ৯ ফুট।
- নির্বাচনের দিন ও প্রচারের সময় কোনো ধরনের ড্রোন, কোয়াদকপ্টার বা এ জাতীয় যন্ত্র ব্যবহার করা যাবে না।
- প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাঁর পক্ষে অন্য কোনো প্রার্থী ও প্রতিষ্ঠান ভোটের জিপ বিতরণ করতে পারবে। তবে ভোটের জিপে প্রার্থীর নাম, ছবি, পদের নাম ও প্রতীক উল্লেখ করতে পারবে না।

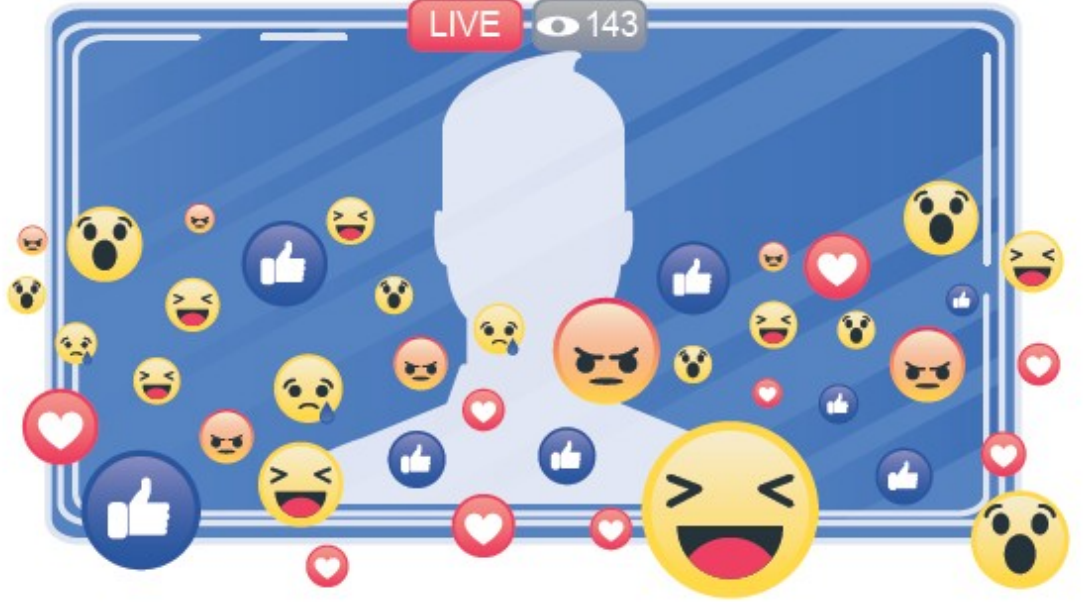
বিলবোর্ড ব্যবহার নির্বাচনি প্রচারণার ক্ষেত্রে

- (ক) যে কোনো ধরনের বিলবোর্ড ব্যবহার করা যাইবে, তবে বিলবোর্ডে প্রচারণার অংশের আয়তন অনধিক ১৬ (ষোল) ফুট × ৯ (নয়) ফুট হইতে হইবে;
- (খ) কোনো প্রার্থী কোনো নির্বাচনি এলাকায় ২০ (বিশ) টির অধিক বিলবোর্ড ব্যবহার করিতে পারিবেন না;
- (গ) বিলবোর্ড স্থাপনের মাধ্যমে কোনক্রমেই জনসাধারণের বা যানবাহন চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি করা যাইবে না, এবং পরিবেশের ক্ষতি বা নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে এমনভাবে বিলবোর্ড স্থাপন করা যাইবে না।
- ব্যানার, ফেস্টুন ও লিফলেটে পলিথিনের আবরণ নয় এবং প্লাস্টিক (পিভিসি) ব্যানার ব্যবহার করা যাবে না।
- সরকারি সুবিধাভোগী অতিগুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির তালিকায় অন্তর্ভুক্তিকালীন/তদ্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা, উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যদেরও যোগ করা হয়েছে। ফলে তাঁরা প্রার্থীর হয়ে প্রচারে নামতে পারবেন না।
- প্রচারে পরিবেশবান্ধব সামগ্রী ব্যবহারে জোর দেওয়া হয়েছে; প্রচারসামগ্রীতে পলিথিন, রেকসিনের ব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।
- প্রচারের সময় শব্দের মাত্রা ৬০ ডেসিবেলে রাখতে হবে।
- আচরণবিধি মেনে চলার ব্যাপারে প্রার্থী ও দলের কাছ থেকে অঙ্গীকারনামাও দিতে হবে।
- আচরণবিধির ‘গুরুতর’ অপরাধের ক্ষেত্রে আরপিওতে প্রার্থীতা বাতিলের বিধান রয়েছে। আগে আচরণবিধিতে আরপিও অনুচ্ছেদটি ছিল না, এবার যুক্ত করা হয়েছে। নির্বাচনি অপরাধে আরপিও ৯১ ধারা অনুযায়ী প্রার্থীতা বাতিল করে থাকে ইসি। এ বিষয়টি আচরণ বিধিমালায় স্পষ্ট করা হয়েছে।
- গণমাধ্যমের সংলাপ ও সব প্রার্থীর এক মঞ্চে ইশতাহার ঘোষণার সুযোগ রাখা হয়েছে। রিটার্নিং কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট আসনে সব প্রার্থীকে নিয়ে একদিনে তাঁদের ইশতাহার বা ঘোষণাপত্রগুলো পাঠ করার ব্যবস্থা করবেন।



প্রচার-প্রচারণাসহ
নির্বাচনসংশ্লিষ্ট
কোনো বিষয়ে
অসদুদ্দেশ্যে কৃত্রিম
বুদ্ধিমত্তা (AI)
ব্যবহার করা যাবে
না।

নির্বাচনি প্রতিবেদনে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম



নির্বাচনি প্রতিবেদনে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম

ডিজিটাল যুগে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নির্বাচনি খবর সংগ্রহ, প্রচার এবং বিশ্লেষণের ধরনকে আমূল পরিবর্তন করেছে। বর্তমান যুগে যোগাযোগ প্রযুক্তি ছাড়া সাংবাদিকতা কল্পনাই করা যায় না। ফেসবুক, এক্স (টুইটার), ইউটিউব বা টিকটকের মতো প্ল্যাটফর্ম আজ তথ্য বিনিময়ের দ্রুততম মাধ্যম। বিশ্বব্যাপী দ্রুত সংবাদ সংগ্রহ ও সরবরাহ এবং এর সৃষ্টিশীলতা বাড়াতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এখন অত্যাবশ্যকীয়। এর মাধ্যমে মুহূর্তে খবর ছড়িয়ে পড়ে, জনমত গঠিত হয়। এ মাধ্যমেও গণমাধ্যমকর্মীরা সরাসরি দর্শকদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। ফলে আধুনিক নির্বাচনি সাংবাদিকতায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এখন এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

তাৎক্ষণিক তথ্যপ্রাপ্তি

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গণমাধ্যমকর্মী মুহূর্তের মধ্যে তথ্য পেতে ও পাঠাতে সক্ষম হন। প্রার্থীর ঘোষণা, প্রচারণার পরিবর্তন, ভোটকেন্দ্রে অনিয়ম বা সহিংসতার মতো ঘটনা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। লাইভ রিপোর্টিং, মতামত জরিপ বা ইন্টারঅ্যাকটিভ কন্টেন্ট ভোটারদের আরও সম্পৃক্ত

ও সচেতন করে। ব্যবহারকারীর তোলা ছবি, ভিডিও ও প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ সাংবাদিকদের মাঠপর্যায়ের তথ্য সংগ্রহে সহায়তা করে, বিশেষত দুর্গম বা নিষিদ্ধ এলাকায়। সংক্ষিপ্ত ভিডিও, ইনফোগ্রাফিক বা লাইভস্ট্রিম রাজনৈতিক খবরকে আরও সহজবোধ্য করে এবং অধিক মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের আগ্রহ সৃষ্টি করে।

ঝুঁকি ও নৈতিক চ্যালেঞ্জ

সুবিধার পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রয়েছে নানা ঝুঁকি। গুজব, ভুয়া তথ্য, ডিপফেক বা বিকৃত ভিডিও অনেক সময় ভোটারদের বিভ্রান্ত করে তুলতে পারে। পক্ষপাতদুষ্ট তথ্যে জনমতকে বিকৃত করতে পারে। তাই সাংবাদিকদের দ্রুততার সঙ্গে, নির্ভুলতার সঙ্গে ভারসাম্য রক্ষা করতে হয় এবং কঠোর যাচাই প্রক্রিয়া ও নৈতিক মানদণ্ড অনুসরণ করতে হয়। গণমাধ্যমকর্মীকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত নৈতিকতার মানদণ্ডে তথ্য যাচাই এবং আরও সতর্ক ও দায়িত্বশীল হতে হবে।

ভুয়া খবর



ভুয়া খবর হলো ইচ্ছাকৃতভাবে তৈরি মিথ্যা, বিভ্রান্তিকর বা বিকৃত তথ্য, যা সত্য সংবাদ হিসেবে প্রচার করা হয় মানুষকে বিভ্রান্ত বা প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে। সাধারণ গুজব বা ভুলের চেয়ে ভুয়া খবর বেশি সুপরিকল্পিত, যার লক্ষ্য নির্দিষ্ট রাজনৈতিক স্বার্থরক্ষা, জনমত পরিবর্তন বা কোনো ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি করা।

ভুয়া খবর বিভিন্ন রূপে দেখা যায়। সম্পূর্ণ মনগড়া গল্প, আংশিক সত্য কিন্তু অতিরঞ্জিত বা বিকৃত তথ্য, বিভ্রান্তিকর শিরোনাম, সম্পাদিত বা পরিবর্তিত ছবি, ভিডিও, ডিপফেক অথবা ব্যঙ্গাত্মক কনটেন্টকে সত্য সংবাদ হিসেবে উপস্থাপন।

ভুয়া খবর বা ফেক নিউজ আজকের সাংবাদিকতার অন্যতম বড়ো চ্যালেঞ্জ, বিশেষত নির্বাচনি সময়ে। এ সময় এগুলো আরও বিপজ্জনক হয়ে ওঠে, কারণ এগুলো সরাসরি ভোটারদের উপলব্ধি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণকে প্রভাবিত করে। ডিজিটাল মিডিয়ার বিস্তারের ফলে ভুল তথ্য মুহূর্তেই ছড়িয়ে পড়ে—জনমতকে প্রভাবিত করে, ভোটারদের বিভ্রান্ত করে এবং নির্বাচনি প্রক্রিয়ার প্রতি আস্থা ক্ষুণ্ণ করে।

ভুয়া খবর শুধু ভুল তথ্য নয়—এটি গণতন্ত্রের প্রতি একটি গুরুতর হুমকি, বিশেষত নির্বাচনের সময়। এর দ্রুত বিস্তার, আবেগপ্রবণ উপস্থাপন ও জনমতকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা একে বিপজ্জনক করে তোলে। তাই নির্বাচনি সাংবাদিকদের জন্য ভুয়া খবর শনাক্ত ও মোকাবিলা করে সত্য তথ্য উপস্থাপন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সঠিক তথ্যনির্ভর সাংবাদিকতা নির্বাচনি প্রক্রিয়ার সুষ্ঠুতা ও ভোটারদের সচেতন সিদ্ধান্ত নিশ্চিত করতে সাহায্য করে।

গুজব : নির্বাচন এবং সাংবাদিকতার প্রেক্ষাপটে



গুজব হলো এমন তথ্য, যা সহসাই যাচাই-বাছাই করা যায় না এবং দ্রুত মানুষ থেকে মানুষে ছড়ায়। এটি সত্য ও মিথ্যা দুটিই হতে পারে। সব সময় ইচ্ছাকৃত মিথ্যা নয়, তবে তা ভুল ধারণা সৃষ্টি করতে পারে। নির্বাচনের সময় গুজব প্রার্থীর ক্ষমতা, দলীয় অবস্থান বা ভোটারের ফলাফল নিয়ে নানাভাবে মানুষকে প্রভাবিত করে।

গুজবের শক্তি অনেক বেশি। এটি দ্রুত ছড়ায়, মানুষকে আবেগপ্রবণ করে তোলে। ভয়, উত্তেজনা বা আশা জাগায়। বারবার শোনার কারণে সত্য বলে মনে হয়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গুজব মুহূর্তের মধ্যে ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়ে। গুজবের নির্ভরযোগ্য সূত্র নেই, মানুষকে প্রভাবিত করতে আবেগ ব্যবহার করে, এক ব্যক্তির কাছ থেকে অন্যের কাছে তাড়াতাড়ি যায়, অস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীনতা এবং তথ্য ধোঁয়াশা সৃষ্টি করে।

নির্বাচনি প্রতিবেদনে গুজব গুরুত্বপূর্ণ হলেও ঝুঁকিপূর্ণ সঠিকভাবে পরিচালনা করা হলে গুজব থেকে আসা কিছু ইঙ্গিত সমস্যা বা অনিয়মের খবর দিতে পারে। কিন্তু যাচাই না করে প্রচার করলে এটি ভোটারদের মাঝে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে, অবিশ্বাস ও উত্তেজনা বাড়ায় এবং নির্বাচনকে অনিয়মিত বা অস্থির করে তুলতে পারে। গণমাধ্যমকর্মীদের দায়িত্ব হলো গুজবকে সত্য মনে না করা, তথ্য যাচাই, প্রয়োজন হলে সতর্কতা জানানো এবং দ্রুত উৎস খোঁজা এবং ভুল সংশোধন করা।

ভুয়া খবর
(Fake News)
গুজব
(Rumour)

হেট স্পিচ



হেট স্পিচ
(Hate Speech)
ফ্যাক্ট চেকিং এবং
নির্বাচনি প্রতিবেদন

হেট স্পিচ নির্বাচনের সময় একটি শক্তিশালী ও বিপজ্জনক অস্ত্র। এটি নির্বাচন প্রক্রিয়াকে বিঘ্নিত, ভোটারদের প্রভাবিত এবং সমাজে অস্থিরতা সৃষ্টি ও বিভাজন তৈরি করতে পারে। যার ফলে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় দুর্বলতা আসতে পারে। তাই সাংবাদিক বা গণমাধ্যমকর্মীর দায়িত্ব হলো এটি শনাক্ত ও বিশ্লেষণ করা এবং দায়িত্বশীলভাবে প্রতিবেদন করা, যাতে নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরাপদ থাকে।

দায়িত্বশীল ও নৈতিক সাংবাদিকতা হেট স্পিচের প্রভাব কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। গণমাধ্যমকর্মী যদি সঠিকভাবে তথ্য বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন করেন, তবে ভোটাররা সত্য তথ্য পান এবং নির্বাচন আরও স্বচ্ছ ও নিরাপদ হয়।

দায়িত্বশীল ও নৈতিক সাংবাদিকতা হেট স্পিচের প্রভাব কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। গণমাধ্যমকর্মী যদি সঠিকভাবে তথ্য বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন করেন, তবে ভোটাররা সত্য তথ্য পান এবং নির্বাচন আরও স্বচ্ছ ও নিরাপদ হয়।

নির্বাচনি প্রতিবেদনে হেট স্পিচ বোঝা কেন গুরুত্বপূর্ণ

- এটি ভোটারদের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে পারে,
- গণতান্ত্রিক পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়,
- সংঘাত বা উত্তেজনার ঝুঁকি আগেই শনাক্ত করা যায়,
- সঠিক প্রতিবেদনের মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করা যায় এবং

- নির্বাচনকে স্বচ্ছ ও ন্যায্য রাখতে সহায়তা করে।

হেট স্পিচের প্রভাব অত্যন্ত তীব্র

- এটি আবেগ উদ্বেজিত করে রাগ বা ঘৃণা ছড়ায়,
- সমাজে মেরুকরণ বাড়ায়,
- সোশ্যাল মিডিয়ার কারণে মুহূর্তেই ছড়িয়ে পড়ে এবং
- কখনো সহিংসতার ঝুঁকি তৈরি করে।

গণমাধ্যমকর্মীর করণীয়

- তথ্য যাচাই করে প্রকাশ করা,
- হেট স্পিচ প্রচার বা পুনরাবৃত্তি এড়ানো,
- প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করা এবং
- জনগণকে এর ক্ষতি সম্পর্কে জানানো।

উদ্দেশ্যমূলক প্রচার

প্রোপাগান্ডা হলো এমন উদ্দেশ্যমূলক যোগাযোগ, যা বাড়াই করা তথ্য, আবেগের ব্যবহার ও বিভ্রান্তিকর উপস্থাপনার মাধ্যমে মানুষের বিশ্বাস ও আচরণকে প্রভাবিত করে। এর জন্ম ধর্মীয় প্রচার থেকে হলেও সময়ের সঙ্গে এটি যুদ্ধ, রাজনীতি ও গণমাধ্যমে শক্তিশালী হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে।

প্রোপাগান্ডার শক্তি হলো—এটি দ্রুত জনমত বদলে দিতে পারে, ভয় বা আশা তৈরি করে ভোটারকে প্রভাবিত

করতে পারে এবং একতরফা বার্তা বারবার ছড়িয়ে সত্যের মতো মনে করাতে পারে। এর বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আছে আবেগকে প্রাধান্য, তথ্য গোপন, বিকৃতি, বার্তার পুনরাবৃত্তি, সহজ শ্লোগান, শত্রু তৈরি প্রভৃতি।

নির্বাচনি সময় প্রোপাগান্ডা রাজনৈতিক প্রতিযোগিতাকে প্রভাবিত, বিভ্রান্তি ছড়ানো এবং গণতান্ত্রিক পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। নির্বাচনের সময় এর প্রভাব আরও বাড়ে। তাই গণমাধ্যমকর্মীদের সতর্ক, বিশ্লেষণী ও নৈতিকভাবে দায়িত্ব পালন করা জরুরি।

প্রোপাগান্ডা এমন এক শক্তিশালী হাতিয়ার, যা রাজনীতিকে ভুলপথে চালিত, ভোটারদের প্রভাবিত এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। প্রোপাগান্ডা শনাক্ত ও ব্যাখ্যা করতে পারলে গণমাধ্যমকর্মী ভোটারকে সত্যের কাছে পৌঁছে দিতে এবং নির্বাচনকে আরও স্বচ্ছ ও বিশ্বস্ত রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন।

ফ্যাক্ট চেকিং এবং নির্বাচনি প্রতিবেদন

ডিজিটাল যুগে তথ্য দ্রুত ছড়ায়। এর সঙ্গে ছড়ায় গুজব, ভুল তথ্য ও মনগড়া প্রচারণা, যা সমাজে বিভাজন সৃষ্টি এবং জনগণের মাঝে বিভ্রান্তি তৈরি করে। ফ্যাক্ট চেকিং এসব বিভ্রান্তির বিরুদ্ধে একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিরক্ষা হিসেবে কাজ করে। তাছাড়া জনসচেতনতা বৃদ্ধি, গণমাধ্যমের বিশ্বাসযোগ্যতা ধরে রাখা, গণতন্ত্রকে শক্তিশালী এবং দায়িত্বশীল সাংবাদিকতা চর্চায় সহায়তা করে ফ্যাক্ট চেকিং।

এটি এমন একটি পদ্ধতি, যার মাধ্যমে কোনো তথ্য, দাবি বা বক্তব্যের সত্যতা যাচাই করা হয় নিরপেক্ষ উৎসের মাধ্যমে। গণমাধ্যমে প্রচারিত তথ্য সঠিক কি না, রাজনৈতিক নেতারা বা নির্বাচনি প্রচারণায় অংশ নেওয়া ব্যক্তি যে বক্তব্য দিচ্ছেন, তা বাস্তবতার সঙ্গে মিলছে কি না—এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে ফ্যাক্ট চেকিং জনসাধারণকে নির্ভরযোগ্য তথ্য নিশ্চিত করে।

ফ্যাক্ট চেকিং-এর কাজ

- তথ্যের সত্যতা যাচাই: তথ্য, পরিসংখ্যান, ছবি, ভিডিও কিংবা বক্তব্যের যথার্থতা যাচাই করে বিভ্রান্তি দূর করা।
- ভুল তথ্য শনাক্ত: গুজব, ভুয়া খবর, বিকৃত তথ্য বা বিভ্রান্তিকর প্রচারণা শনাক্ত করে জনসাধারণকে সতর্ক করা।
- বিশ্বস্ত উৎস ব্যবহার: সরকারি নথি, স্বতন্ত্র গবেষণা, বিশেষজ্ঞ মতামত ও নির্ভরযোগ্য ডেটা ব্যবহার করে সত্য প্রতিষ্ঠা করা।
- প্রমাণভিত্তিক প্রতিবেদন: যাচাই করা তথ্যের ভিত্তিতে স্পষ্ট ব্যাখ্যা ও উৎসগুলো উপস্থাপন করা।

আজকের তথ্যবহুল যুগে যে কোনো খবর, বক্তব্য বা ছবি দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে পারে। তাই সাংবাদিক ও সাধারণ নাগরিক উভয়ের জন্যই তথ্য যাচাই করা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

যদি কোনো খবর বা বক্তব্য যাচাই করতে হয়, প্রথমেই তার উৎস নির্ধারণ করা উচিত। তথ্যটি কি বিশ্বস্ত সংবাদমাধ্যম, সরকারি নথি বা বিশেষজ্ঞের উদ্ধৃতি থেকে এসেছে, তা যাচাই করা উচিত। এরপর একই বিষয় অন্যান্য নির্ভরযোগ্য সূত্রে অনুরূপভাবে প্রকাশিত হয়েছে কি না পরীক্ষা করা হয়। প্রকাশিত তথ্যের সঙ্গে যুক্ত পরিসংখ্যান, দলিল বা প্রমাণাদি যাচাই করা হয় এবং যদি প্রয়োজন হয়, তাহলে তারিখ ও প্রেক্ষাপট নিশ্চিত করা হয়। অতিরিক্তভাবে, ব্যবহৃত ভাষা লক্ষ করা হয়; যদি অতিশয় আবেগপ্রবণ বা উপস্থাপনা লক্ষ করা যায়, তবে সতর্কতার নির্দেশ দেওয়া হয়।

ছবির ক্ষেত্রে সাধারণত নানা ধরনের অ্যাপ ব্যবহার করা হয়, যেমন: রিভার্স ইমেজ সার্চ, Google Images বা TinEye, যা ছবির প্রথম প্রকাশিত ইমেজ এবং প্রেক্ষাপট শনাক্ত করতে সহায়তা করে। সম্ভব হলে মেটাডেটা (EXIF data) পরীক্ষা করা হয়, যা ছবির তারিখ, স্থান এবং ব্যবহৃত ডিভাইস সম্পর্কেও তথ্য প্রদান করে। ছবির ছায়া, দিক বা অন্যান্য অসংগতি লক্ষ করা হয়, যা সম্পাদনার পরিচয় দিতে পারে। ছবিটি যে প্রেক্ষাপটে ব্যবহার করা হচ্ছে, তা যাচাই করা হয়। বাস্তব ছবি ভুল প্রেক্ষাপটে ব্যবহার করা হলে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে।

ফ্যাক্ট চেকিং এবং
নির্বাচনি প্রতিবেদন

জাতীয় সংসদ নির্বাচন আইনসমূহ

ক্রমিক	শিরোনাম
১	The Representation of The People Order, 1972
২	The Members of Parliament (Determination of Dispute) Act, 1980
৩	The Members of Parliament (Determination of Dispute) Act, 1980 (Act No. I of 1981)
৪	জাতীয় সংসদ (সংরক্ষিত মহিলা আসন) নির্বাচন আইন ২০০৪
৫	রাজনৈতিক দল নিবন্ধন বিধিমালা, ২০০৮ (সর্বশেষ সংশোধনসহ)
৬	নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮
৭	নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮ (সংশোধনী)
৮	নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮ এর সংশোধনী (প্রতীকসমূহ) (১৬-০২-২০১৭)
৯	সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০০৮ এর সংশোধনী (২৪-১১-২০১৩)
১০	সংসদীয় নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০০৮
১১	The Delimitation of Constituencies Ordinance, 1976
১২	Representation of the People (Amendment) Ordinance, 2018 (৩১-১০-২০১৮)
১৩	রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০০৮-এর সংশোধনী (৩১-১০-২০১৮)
১৪	স্বতন্ত্র প্রার্থী (প্রার্থিতার পক্ষে সমর্থন যাচাই) বিধিমালা ২০১১
১৫	স্বতন্ত্র প্রার্থী (প্রার্থিতার পক্ষে সমর্থন যাচাই) বিধিমালা, ২০১১-এর সংশোধনী (৩১-১০-২০১৮)
১৬	জাতীয় সংসদ নির্বাচন (ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন) বিধিমালা, ২০১৮ (৭-১১-২০১৮)
১৭	নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮ এর সংশোধনী (৭-১১-২০১৮)
১৮	জাতীয় সংসদের ৩০০টি আসনের পুনর্নির্ধারিত সীমানার চূড়ান্ত তালিকার গেজেট
১৯	গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২
২০	জাতীয় সংসদের নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণ আইন ২০২১
২১	নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮ সংশোধন (২৩-০২-২০২৩)
২২	দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের লক্ষ্যে জাতীয় সংসদের ৩০০টি আসনের নির্বাচনি এলাকার প্রাথমিক সীমানা পুনর্নির্ধারণ-২০২৩ এর গেজেট
২৩	আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের লক্ষ্যে জাতীয় সংসদের ৩০০টি আসনের পুনর্নির্ধারিত সীমানার চূড়ান্ত তালিকার গেজেট বিজ্ঞপ্তি
২৪	জাতীয় সংসদ নির্বাচনের লক্ষ্যে 'জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটকেন্দ্র স্থাপন এবং ব্যবস্থাপনা নীতিমালা'
২৫	Representation of the People (Amendment) Act, 2023 এর গেজেট
২৬	নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮ এর সংশোধন সংক্রান্ত গেজেট (২৭-০৯-২০২৩)
২৭	জাতীয় সংসদ (সংরক্ষিত মহিলা আসন) নির্বাচন (সংশোধন) আইন, ২০২৩ এর গেজেট (18-09-2023)
২৮	জাতীয় সংসদ নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণ আইন, ২০২১ সংশোধন সংক্রান্ত গেজেট। (অধ্যাদেশ নং-২৩, ২০২৫)
২৯	জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটকেন্দ্র স্থাপন এবং ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০২৫
৩০	জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটকেন্দ্র স্থাপন এবং ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০২৫ (০১-০৯-২০২৫)
৩১	নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮-এর সংশোধনী (প্রতীক) ৩০-১০-২০২৫
৩২	৩০০ আসনের প্রাথমিক তালিকার গেজেট ৩০-০৭-২০২৫
৩৩	৩০০ আসনের সীমানার চূড়ান্ত গেজেট ০৪-০৯-২০২৫
৩৪	Representation of the People Order, 1972-এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত অধ্যাদেশ (০৩-১১-২০২৫)
৩৫	রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫ (১০-১১-২০২৫)

তথ্যসূত্র / References

- Handbook on Election Reporting –by SEHD
- Training Manual for journalist by News Network
- বন্ধনিষ্ঠ নির্বাচন সাংবাদিকতা by Media Resources Development Initiative (MRDI)
- Articles on democracy, elections and media published by Nirikhha, A monthly publication by PIB
- Media and Elections: An Elections Reporting Handbook / Ross Howard; edited by Amanda Gibb
- Election Observation Handbook, Published by the OSCE Office for Democratic Institutions
- Elections reporting and peace journalism manual: Corporate author: Zimbabwe Media Commission
- Guidelines for Professional Election Reporting, by International Media
- Support (IMS) and Fojo Media Institute
- The Role of the Media in Electoral Processes by OAS - Organization of American States
- Responsible Media Coverage of Elections by Search for Common Ground
- Role of media in elections by Academia.edu
- And articles on democracy, elections, media, politics and recent uprising published by various national dailies

নোট

[illegible]

পিআইবির সাম্প্রতিক প্রকাশনা



GUIDELINES FOR ELECTION REPORTING Supported by



UN Electoral Project
BALLOT & DRIP

